দারসে কুরআন

৩

অধ্যাপক আবদুল মতিন

দারসে কুরআন

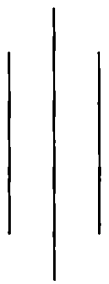

৩য় খন্ড

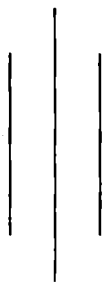

অধ্যাপক আবদুল মতিন

www.pathagar.com

দারসে কুরআন-৩য় খন্ড

প্রকাশনায় ঃ
সাহাল প্রকাশনী
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর), খুলনা।

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশঃ মে-২০০৪ ইং
১০ম মুদ্রণ ঃ ফেব্রুয়ারী-২০১২ ইং
রবিউস সানি-১৪৩৩ হিজরী
ফাল্গুন-১৪১৮ সন

সত্ত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্টি কম্পিউটার,
৩০৮, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।

অক্ষর বিন্যাস ঃ সাহাল বিন মতিন
৩০, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।

মুদ্রণে ঃ ঈগল অফসেট প্রেস
শামসুর রহমান রোড, খুলনা।

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৬০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ সাহাল বুক কর্ণার
৩০৮, খানজাহান আলী রোড,
(তারের পুকুর), খুলনা।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩৮৯০৭৬ (লেখক)
ঃ ০১১৯১-৭৮২২৮৬ (দোকান)

প্রাপ্তিস্থান

কুরআন মহল, সিলেট।	কাটাবন বুক কর্ণার, ঢাকা।
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বরিশাল।	ঢাকা বুক কর্ণার, পুরানাপল্টন, ঢাকা।
আল-হেলাল লাইব্রেরী, যশোর।	তাসনিয়া বই বিতান, মগবাজার, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সিলেট।	খন্দকার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
আল-আমীন লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা।	প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা।
একাডেমী লাইব্রেরী, দেওয়ান বাজার,চট্টগ্রাম।	প্রফেসরস পাবলিকেশন, মগবাজার, ঢাকা।

এ ছাড়াও জেলা শহরের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়

www.pathagar.com

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব যা মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়।

মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যাবতীয় সমাধান আল কুরআনে রয়েছে। এজন্য প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উচিত আল কুরআন নিজের ভাষায় বুঝে তার শিক্ষানুযায়ী বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা। কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের দেশের সামাজিক ও শিক্ষা ব্যবস্থায় আল-কুরআনের সঠিক শিক্ষাকে তুলে ধরার তেমন কোন বাস্তব মাধ্যম নেই। যতটুকু আছে তাও আবার সিলেবাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং কুরআনকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল কুরআনের বিধি-বিধান মানতে হলে কুরআনের আসল বুঝ থাকা প্রয়োজন। প্রকৃত বুঝ দেবার জন্যই আমি কুরআনের বাছাইকৃত অংশ থেকে 'দারসে কুরআন' খন্ড আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তারই অংশ হিসেবে তৃতীয় খন্ড প্রকাশ করা হলো। যার সহযোগিতা নিয়ে কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা দারস প্রদানের মাধ্যমে কুরআনের সঠিক শিক্ষা সহজে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দিতে পারেন।

আমি 'দারসে কুরআন' বইটি ইসলামী আন্দোলনের আধুনিক ও সাধারন শিক্ষিত কর্মী ভাই-বোনদের দারস পেশ করার উপযোগী করে লেখার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া দারসে কুরআনের প্রথম খন্ডের প্রথম দিকে কুরআনকে সহজে বুঝানোর জন্য ধারাবাহিক ভাবে দারস দানের পদ্ধতি ও দারসের সময় বন্টনের নমুনা হিসেবে চারটি ছক উল্লেখ করেছি এবং সাধারন মানুষের উপর যাতে দারসের প্রভাব পড়ে সেই জন্য দারস দানকারীর কতিপয় করণীয় উল্লেখ করেছি। বইটি লেখার বিশেষ বৈশিষ্ট হলো শ্রোতার সামনে যেন আপনি নিজেই দারস পেশ করছেন।

www.pathagar.com

দারসে কুরআন তৃতীয় খন্ড লেখা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব গুণগ্রাহী ব্যক্তি পরামর্শ, সময় ও উৎসাহ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের শুকরিয়া আদায় করছি এবং মহান আল্লাহ্‌র কাছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

লেখা ও ছাপার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। অতএব কোন সুহৃদয় ব্যক্তির কাছে যদি কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে কিম্বা কোন পরামর্শ থাকে তাহলে আমাকে সরাসরি জানালে আমি চির কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তিতে সংশোধন করে পূনঃমুদ্রণ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তাবারাক ওয়া তায়ালার কাছে আমার আরজ, হে আল্লাহ্‌ ! তোমার এই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ব্যখ্যা ও শিক্ষা পেশ করতে যেয়ে যদি আমার অজানতে কোন ভুল-ত্রুটি কিম্বা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তাহলে তুমি মেহেরবানি করে আমাকে ক্ষমা করে দিও। আর আমার সীমিত জ্ঞানের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে আখিরাতে আদালতে নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিও। আমীন।।

মুহাম্মদ আবদুল মতিন
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক ইস্টাডিজ বিভাগ
দৌলতপুর কলেজ, খুলনা।

মে- ২০০৪ ইং

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০ জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব। (সূরা তাওবাহ-১৯-২৪)	০৭
০ কতিপয় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, ওয়াদা এবং কসম রক্ষা করার গুরুত্ব। (সূরা নহল-৯০-৯৭)	২৭
০ অতীতের নবীদের দ্বীনের ন্যায় একই দ্বীনের দাওয়াত দান এবং প্রতিষ্ঠার নির্দেশ। (সূরা শু'রা-১৩-১৬)	৫২
০ ঈমানের পরীক্ষা দিয়েই জান্নাতে যেতে হবে। (সূরা আনকাবুত-১-৭)	৭৬
০ আল্লাহর উপর অবিচল ঈমান। সর্বোত্তম পন্থায় দাওয়াত দান ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন। (হা-মীম-আস-সাজদাহ-৩০-৩৬)	৯৭
০ দাওয়াতে দ্বীনের কাজে অধৈর্য হলে চলবে না। (সূরা আনয়াম-৩৩-৩৬)	১১৭
০ স্ত্রী-সন্তান এবং ধন-সম্পদ মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। (সূরা তাগাবুন-১৪-১৮)	১৩২
০ আখিরাতে অবিশ্বাসীদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ। (সূরা মাউন)	১৫০

১ম খন্ডে যা আছে

০ দারসে কুরআন এর বক্তৃতা দান পদ্ধতি।
০ দারসের সময় বন্টন।
০ দারস দানকারীর করণীয়।
০ দারসের কতিপয় পরিভাষার সংজ্ঞা।
০ এক নজরে আল-কুরআনের পরিচয়।
০ মুত্তাকীনদের গুণাবলী। (সূরা বাকারা-১-৫)
০ মু'মিনদের গুণাবলী। (সূরা মু'মেনুন-১-১১)
০ বাড়ীতে ঢোকার শিষ্টাচার। (সূরা নূর-২৭-২৯)
০ ধ্বংস ও ক্ষতি থেকে মানুষের বাঁচার উপায়। (সূরা আল আসর)
০ কঠিন আযাব থেকে বাঁচার উপায়। (সূরা সফ্ -১০-১৩)
০ মানবতার মুক্তির জন্য জিহাদ। (সূরা নিসা-৭৫-৭৬)
০ ঈমানের পরীক্ষা। (আলে ঈমরান-১৩৯-১৪১)

www.pathagar.com

০ সবরের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা ও শহীদের মর্যাদা।
(সূরা বাকারা-১৫৩-১৫৬)
০ মরণের আগেই আল্লাহর পথে অর্থ খরচ। (সূরা মুনাফিকুন-৯-১১)
০ কিয়ামতের দৃশ্য। (সূরা হজ্ব-১-২)

২য় খন্ডে যা আছে

০ জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব। (সূরা আলাক-১-৫)
০ মুমিনের জিন্দেগী হবে তাকওয়া, আন্দোলন ও দাওয়াতী জিন্দেগী।
(সূরা আলে-ঈমরান-১০২-১০৪)
০ মুমিন জীবনের লক্ষৎ-উদ্দেশ্য ও তাদের বৈশিষ্ট্য
(সূরা তাওবা-১১১-১১২)
০ মুমিনদের ছয়টি বর্জনীয় আচরণ। (সূরা হুজুরাত-১১-১২)
০ দুনিয়াদারদের প্রতি সতর্কবাণী। (সূরা তাকাছুর-১-৮)
০ ইসলামী আন্দোলনঃ কর্মীদের গুণাবলী (সূরা মায়িদাহ-৫৪-৫৬)
০ আল্লাহর কতিপয় কুদরত ও নি'য়ামত। (সূরা আন নাবা-১-১৬)
০ মুনাফিকদের আচরণ। (সূরা বাকারা-৮-১৬)

৪র্থ খন্ডে যা আছে

০ জিহাদ-সংগ্রাম এবং ধৈর্যের পরীক্ষার মাধ্যমেই
জান্নাত পাওয়া যাবে। (সূরা ঈমরান-১৪২-১৪৭)
০ জান্নাতের সুখ আর জাহান্নামের দুঃখ। (সূরা যুখরুফ-৬৭-৭৮)
০ চূড়ান্ত আন্দোলনের পরই আল্লাহর সাহায্য
ও বিজয় আসে। (সূরা নসর)
০ ঝুঁকিপূর্ণ আন্দোলন থেকে এড়িয়ে থাকার বাহানা
তালাশ না করা। (সূরা তাওবাহ-৩৮-৪১)
০ অসার ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব, প্রাচুর্য
গড়ার কাজে প্রতিযোগিতা না করা। (সূরা হাদীদ-২০-২৩)
০ মানুষের কতিপয় নৈতিক দোষ ও ত্রুটি এবং তার
পরিণতি। (সূরা হুমাজাহ)
০ আল্লাহর বাছাইকৃত মুমিনদের প্রকৃত জিহাদ-আন্দোলন
করা কর্তব্য। (সূরা হজ্জ-৭৮)
০ শেষ রাতের নামায এবং কুরআন তিলাওয়াত তাকওয়ার
জন্য খুব বেশী কার্যকর। (সূরা মুয্যাম্মিল-১-১৩)

www.pathagar.com

এক

জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব

(সূরা আত্ তাওবাহ্ - ১৯-২৪)

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ
الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ط
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ
رِضْوَانٍ وَّ جَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ○ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط
اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ
وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ط وَمَنْ يَّتَوَ
لَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ
وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ
اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ

www.pathagar.com

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

সরল অনুবাদঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১৯) (হে মুমিনগণ!) তোমরা কি হাজিদের পানি পান করানো এবং 'মসজিদে হারাম' এর সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাকে সেই লোকের কাজের সমান মনে করে নিয়েছো, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি এবং যুদ্ধ-জিহাদ করে আল্লাহ্র পথে ? আল্লাহ্র কাছে তো এই দুই শ্রেণীর লোক এক ও সমান নয়। আর আল্লাহ্ যালেম লোকদের হেদায়াত করেন না। (২০) আল্লাহ্র কাছে তো সেই সব লোকদেরই বেশী মর্যাদা রয়েছে, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে বা নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ (আন্দোলন) করেছে, তারাই সফলকাম। (২১) (এদের জন্যে) তাদের পরওয়ারদেগার নিজের রহমত ও সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে আছে তাদের জন্য চিরস্থায়ী শান্তি। (২২) সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কাছে আছে মহা পুরস্কার। (২৩) হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের বাপ-ভাইদের বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে বেশী ভালবাসে। তোমাদের মধ্যে যেসব লোক এ ধরনের লোকদেরকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে তারাই হবে সীমালংঘণকারী। (২৪) (হে নবী!) তাদেরকে বলে দিন, যদি তোমাদের কাছে তোমাদের বাপ, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী ও তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের কামাই করা ধন-মাল, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যা মন্দা বা বন্ধ হয়ে যাবার তোমরা ভয় করো, আর তোমাদের সেই ঘর-বাড়ী যাকে তোমরা খুব পছন্দ করো- আল্লাহ্, তার রাসূল ও তার পথে জিহাদ (আন্দোলন) করা থেকে প্রিয় ও ভালবাসার হয়, তাহলে তোমরা অপেক্ষা করো আল্লাহ্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ্ তো ফাসেক লোকদেরকে কখনই হেদায়েত করেন না।

www.pathagar.com

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اَجَعَلْتُمْ -তোমরা মনে করে নিয়েছো কি ? سِقَايَةَ - পানি পান করানো। اَلْحَاجِّ -হাজিদের। وَ -এবং/ ও। عِمَارَةَ -সেবা করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা, আবাদ করা। كَمَنْ -তার সমান যে। اٰمَنَ -ঈমান এনেছে। يَوْمِ الْاٰخِرِ -আখেরাতের দিনের বা পরকালের। جٰهَدَ - প্রাণান্তকর চেষ্টা করে, জিহাদ বা আন্দোলন করে। فِىْ سَبِيْلِ اللهِ -আল্লাহ্‌র পথে। لَا يَسْتَوٗنَ - তার সমান নয়। عِنْدَ -আল্লাহ্‌র কাছে বা দৃষ্টিতে। اللهِ لَا يَهْدِىْ -হেদায়েত দেন না বা সঠিক পথ দেখান না। قَوْمَ -জাতি বা লোকদের। اَلَّذِيْنَ -যারা। هَاجَرُوْا - হিজরত করেছে বা ত্যাগ করেছে। بِاَمْوَالِهِمْ -তাদের সম্পদ দিয়ে। وَاَنْفُسِهِمْ -এবং তাদের জানসমূহ দিয়ে। اعظم -অতি উচ্চ বা অতি বড়। دَرَجَةً -মর্যাদা বা সম্মান। وَاُولٰئِكَ -এবং ওরাই বা ঐসব লোকেরাই। الْفَائِزُوْنَ -সফলকাম বা কৃতকার্য। يُبَشِّرُهُمْ -তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন। رَبُّهُمْ -তাদের রব বা পরওয়ারদেগার। بِرَحْمَةٍ -রহমতের বা দয়ার। مِنْهُ -তাঁর পক্ষ হতে। رِضْوَانٍ -সন্তুষ্টির। لَهُمْ -তাদের জন্য। فِيْهَا -উহাতে বা তার মধ্যে। نَعِيْمٌ -নিয়া'মত বা সুখ-শান্তি। مُقِيْمٌ -স্থায়ী। خٰلِدِيْنَ فِيْهَا -উহাতে চিরদিন থকবে। اَبَدًا -অনাগত কাল। اِنَّ -নিশ্চয়ই। عِنْدَهٗ -তাঁর কাছে। اَجْرٌ -পুরস্কার বা প্রতিদান। عَظِيْمٌ -মহান, বড়। يٰاَيُّهَا -ওহে। لَاتَتَّخِذُوْا -তোমরা গ্রহণ করো না। اٰبَاءَكُمْ -তোমাদের বাপ-দাদাদের। اخوانكم -তোমাদের ভাইদের। اَوْلِيَاءَ -বন্ধু হিসেবে। اِنِ -যদি। اِسْتَحَبُّوْا -তারা বেশী মহব্বত করে বা ভালবাসে। اَلْكُفْرَ -কুফরীকে। عَلٰى -উপরে, এখানে অপেক্ষা। وَمَنْ -এবং যে। يَتَوَلَّهُمْ -তাদেরকে ভালবাসবে। مِنْكُمْ -তোমাদের মধ্য হতে। هُمُ -তারাই। ظٰلِمُوْنَ -অত্যাচারী। قُلْ -বল।

www.pathagar.com

كَانَ -হয়। اٰبَآؤُكُمْ -তোমাদের বাপ-দাদারা। اَبْنَآؤُكُمْ -তোমাদের সন্তানেরা। اِخْوَانُكُمْ -তোমাদের ভায়েরা। اَزْوَاجُكُمْ -তোমাদের স্বামী-স্ত্রীরা। عَشِيْرَتُكُمْ -তোমাদের জ্ঞাতী বা আত্মীয়-স্বজনেরা। اَمْوَالٌ -মালসমূহ। اقْتَرَفْتُمُوْهَا -যা তোমরা অর্জন বা কামাই করেছো। تِجَارَةٌ -ব্যবসা-বাণিজ্য। تَخْشَوْنَ -তোমরা ভয় করো। كَسَادَهَا -যার মন্দা পড়ার বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার। مَسٰكِنُ -বাসগৃহ বা ঘর-বাড়ী সমূহ। تَرْضَوْنَهَآ -যা তোমরা পছন্দ করো। اَحَبَّ -বেশী প্রিয় হয়। اِلَيْكُمْ -তোমাদের কাছে। مِنْ -থেকে বা হতে। جِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ - তার পথে জিহাদ বা আন্দোলন বা চেষ্টা সাধনা থেকে। فَتَرَبَّصُوْا - তবে তোমরা অপেক্ষা করো। حَتّٰى -যতক্ষণ না। يَاْتِىَ -আসে বা দেন। بِاَمْرِهٖ -তার নির্দেশ বা ফায়সালাকে। اَلْقَوْمَ -জাতি বা লোকদেরকে। اَلْفٰسِقِيْنَ -দুষকার্যকারী বা সত্যত্যাগী।

সম্বোধনঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/প্রোগ্রামে উপস্থিত ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা/ভাই ও বোনের! আস্‌সালামু আলাইকুম অয়ারাহমাতুল্লাহ। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামে হাকীম আল-কুরআনের সূরা তাওবার ১৯ থেকে ২৪ মোট ৬টি আয়াত তিলাওয়াত এবং সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে দারসে কুরআন সঠিকভাবে পেশ করার তাওফীক দান করেন। "অমা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ্।"

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরাটি দুই নামে পরিচিত। একটি 'তাওবাহ্', অপরটি 'বারাআত'।

তাওবাহ্ নামকরণ ঃ এই সূরাটি 'তাওবাহ্' নামকরণের কারণ এই যে, এই সূরার একস্থানে কতিপয় ঈমানদার লোকদের তাওবাহ্ কবুল এবং গোনাহ্-খাতা মাফ করে দেবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বারাআত নামকরণ ঃ 'বারাআত' নামকরণের কারণ হলো, সূরার শুরুতে মুমিনদেরকে মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

'বারাআত' অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ। তবে যে নামই হোক না কেন তা প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবেই করা হয়েছে। শিরোনাম হিসেবে নামকরণ করা হয়নি। তবে যা করা হয়েছে তা ওহীর নির্দেশেই করা হয়েছে। (নামকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দারসে কুরআনের প্রথম খন্ডে দেখুন)।

সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ ঃ সূরাটির শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' লেখা হয়নি। এর কারণ হিসেবে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। কেউ বলেছেন, আল্লাহ পাক মুশরীকদের আচারণে ক্ষুব্ধ হয়ে সূরাটি নাযিল করেন, তার জন্য তিনি বিস্‌মিল্লাহ্ বলেননি। আবার কেউ বলেছেন যে, পূর্বের সূরা 'আনফালের' জের, তাই আর বিস্‌মিল্লাহ্‌র প্রয়োজন হয় না। ইমাম রাযী (রঃ) যে কারণটি উল্লেখ করেছেন, সেটিই হলো সবচেয়ে বেশী সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য। আর তা হলো- রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিজেই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ লেখেননি। তাই পরবর্তীতে সবাই তাঁর অনুকরণ করেছেন।

জানার বিষয় ঃ সূরার প্রথম থেকে তিলাওয়াত আরম্ভ করলে 'বিসমিল্লাহ' পড়া যাবে না। তবে যদি সূরার মাঝ পথ থেকে তিলাওয়াত আরম্ভ করা হয় তাহলে 'বিসমিল্লাহ্' দিয়েই শুরু করতে হবে।

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সূরা তাওবাহ্ একই ভাষণে একই সময় নাযিল হয়নি, বিভিন্ন ঘটণার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। সূরাটি তিনটি ভাষণে সমাপ্ত হয়েছে।

প্রথম ভাষণ ঃ সূরার শুরু থেকে ৫ম রুকু পর্যন্ত চলেছে। এটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়টা হলো ৯ম হিজরীর যিলক্বদ মাস বা তার কাছাকাছি সময়। এ বছর নবী করীম (সঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে 'আমীরুল হজ্জ' বা হজ্জ যাত্রীদের নেতা করে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন, সেই সময় এই ভাষণ অবতীর্ণ হয়। আর তাই নবী করীম (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে এ ভাষণটি হাজিদের পাঠ করে শোনানোর জন্য মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। এ ভাষণে মুশরীকদের সাথে স্থায়ী ভাবে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাষণ ঃ ৬ষ্ঠ রুকুর শুরু থেকে ৯ম রুকুর শেষ পর্যন্ত ভাষণটি চলেছে। এটি ৯ম হিজরীর রজব মাস বা তার কিছু আগে অবতীর্ণ হয়। যখন নবী করীম (সঃ) তৎকালীণ পরাশক্তি রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে তাবুক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এখানে প্রকৃত ঈমানদারদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং দূর্বল মুমিন ও মুনাফিকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় ভাষণ ঃ সর্বশেষ এই ভাষণটি দশম রুকু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। এটা তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে অবতীর্ণ হয়। এই অংশে এমন কতিপয় আয়াত রয়েছে যা বিভিন্ন সময় অবতীর্ণ হয়। বিভিন্নি বিষয় একই হবার কারণে ওহীর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এই ভাষণের সাথে সংযোগ করে দেন। এতে মুনাফিকদেরকে তাম্বীহ্ করা হয়েছে এবং তাবুক যুদ্ধে না যেয়ে যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলো তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। আর যেসব লোক ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও জিহাদে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত ছিলো তাদেরকে ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে।

সূরার বিশেষ দিক ঃ তিনটি ভাষণ নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতার দৃষ্টিতে প্রথম ভাষণটি সূরার সব শেষে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দৃষ্টিতে উহার স্থান সর্বপ্রথম হওয়ার কারণে নবী করীম (সঃ) সূরাতে সংযোজনকালে উহাকে প্রথমে রেখেছেন। তবে যা কিছু করা হয়েছে ওহীর নিদের্শেই করা হয়েছে।

সূরার বিষয়বস্তু ঃ সূরাটিতে অনেকগুলো বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটেছে যেমনঃ

০ সূরার প্রথম অংশে আর্থাৎ ২৮ নম্বর আয়াত পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানদেরকে মুশরীকদের সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

০ সূরার দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ ২৯ থেকে ৩৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত 'আহলে কিতাব' তথা ইয়াহুদী-নাসারাদের সাথে ইসলামের সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে।

০ তৃতীয় অংশে অর্থাৎ ৩৮ থেকে ৪১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে তাবুক যুদ্ধে যাবার জন্য সাধারণ নির্দেশ আসার পরেও যারা দূর্বলতা ও অলসতার কারণে পেছনে থেকে গেছে এবং যুদ্ধে যাইনি তাদের সমালোচনা করা হয়েছে।

০ চর্তুথ অংশ এটি সবচেয়ে দীর্ঘ এবং সূরাটির অর্ধেকেরও বেশী অংশ জুড়ে বিস্তৃত। এ অংশে মুনাফিকদের সমালোচনা ও ভর্ৎসনা, মুসলিম সমাজে তাদের অপঃতৎপরতার নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়েছে। তাদের মানসিক এবং বাস্তব বিবরণ পেশ ও জিহাদ থেকে পিছু হটার ছল-ছূতো,ওজর-বাহানা এবং দুরভিসন্ধির স্বরূপ উৎঘাটন করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, ভুল বুঝাবুঝি ও কাপুরুষতার বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা এবং রাসূল (সঃ) ও নিষ্ঠাবান মুমিনদের নানাভাবে কষ্ট দেয়া ও উত্যক্ত করার বিবরণ দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছে। সেই সাথে মুনাফিকদের চক্রান্ত থেকে নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে সর্তক করা হয়েছে। মুসলমান ও মুনাফিকদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ এবং তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

০ পঞ্চম অংশে মদীনার ইসলামী সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালি জনবল আনসার ও মোহাজের ছাড়াও তাদের চারপাশে কিছু দল ও শ্রেণী ছিলো যেমন বেদুঈনরা। তাদের ভেতর নিষ্ঠাবান মুমিন, মুনাফিক ও দূর্বল মুমিনও ছিলো। সাথে মদীনার মুনাফিকরাও ছিলো। অনুরূপ আরও একটি দল এমন ছিলো, যাদের মধ্যে সৎকাজ ও অসৎকাজের মিশ্রণ ঘটেছিলো এবং তাদের চরিত্রে ইসলামী প্রভাব মজবুত ছিলো, তবে তাদের ইসলামের প্রতি তেমন গভীর আকর্ষণ ছিলো না। আর একটি দল ছিলো, যাদের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানতো না। তাদের পরিণাম কি হবে তা আল্লাহ্ই জানেন। আরও একটি দল ছিলো, যারা ইসলামের নামে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। অত্র সূরায় এসব দল ও শ্রেণী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম সমাজে এদের সাথে কি রকম আচারণ করতে হবে, তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং রাসূল (সঃ) ও একনিষ্ঠ মুসলমানদেরকে এদের সাথে আচরণের পদ্ধতি কি হবে তাও শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। এই অংশ ৯৭ থেকে ১১০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলেছে।

০ ষষ্ঠ অংশে আল্লাহ্র সাথে মুমিনদের ওয়াদা, জিহাদের ধরণ এবং মদীনাবাসী ও তার আশপাশের বেদুঈনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আরো বলা হয়েছে, মদীনাবাসীদের এটা বৈধ নয় যে, তারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্ছন্ন থাকবে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর জীবন রক্ষার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তাছাড়া মুশরিকদের সাথে মুমিনদের সম্পর্কচ্ছেদের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ অংশে এক পর্যায়ে এমন কয়েকজন মুমিনের যুদ্ধে অনুপস্থিতির ঘটনা ও তাদের শাস্তির বিধান বর্ণনা করা হয়েছে যারা খাঁটি মুমিন ছিলেন। এই অংশ ১১১ থেকে ১১৭ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলেছে।

০ সূরার সর্বশেষে উপসংহারে রাসূল (সঃ) এর গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে একমাত্র আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা ১২৮ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে।

দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু ঃ মসজিদ-মাদ্রাসা

www.pathagar.com

এবং সাধারণ দ্বীনি খেদমতের চেয়ে আল্লাহ্‌র কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য এবং মর্যাদাপূর্ণ আ'মল হলো, মজবুত ঈমান ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রাণান্ত কর চেষ্টা-সাধনা করা। এছাড়া আয়াতে বলা হয়েছে নিজের বাপ-দাদা এবং ভায়েরা যদি কুফরিকে অগ্রাধিকার দেয় তাহলে তাদেরকেও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এছাড়া আয়াতে আরো বলা হয়েছে, যদি কেউ নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং দুনিয়ার বস্তু-সামগ্রীকে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদ করা থেকে বেশী গুরুত্ব দেয় ও মহব্বতে ডুবে যায়, তবে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র ভয়াবহ শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

শানে নুযুল ঃ ১৯ থেকে ২২ পর্যন্ত চারটি আয়াত নাযিলের পেছনে বেশ কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত আছে। যেমন-

প্রথম ঘটনা ঃ মক্কার অনেক মুশরিক মুসলমানদেরকে গর্ব করে বলতো, 'মসজিদুল-হারাম'-এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাজিদের পানি পান আমরাই করে থাকি। সুতরাং এর উপর আর কারোর কোন আ'মল শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত আব্বাস (রাঃ) যখন বদর যুদ্ধে বন্দি হন এবং তার মুসলিম আত্মীয়-স্বজন তাকে বাতিল ধর্মের উপর বহাল থাকায় বিদ্রুপের সাথে বলেন, আপনি এখনো ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চীত রয়েছেন। উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা ঈমান ও হিজরতকে বড় শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করে আছো, কিন্তু আমরাও তো মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজিদের পানি সরববাহের ব্যবস্থা করে থাকি। তাই আমাদের সমান আর কারোর আ'মল হতে পারে না। এ ঘটনার পরিপেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত সমূহ নাযিল হয়। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ আব্দুর রাজ্জাক বণনা করেন, হযরত আব্বাস (রাঃ)- এর ইসলাম গ্রহণের পর তালহা বিন শায়বা, হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রাঃ) এর মধ্যে আলোচনা চলছিল। হযরত তালহা বলেন, আমার যে মর্যাদা তা তোমাদের নেই। বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের চাবি আমার দখলে। আমি ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহ্‌র ভিতরেও রাত্রিযাপন করতে পারি। এবার হযরত আব্বাস বললেন, হাজিদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনা আমার হাতে, মসজিদুল-হারামের শাসন ক্ষমতা আমার নিয়ন্ত্রণে। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) বললেন, বুঝতে পারি না এগুলোর উপর তোমাদের এতো গর্ব কেন? আমার কৃতিত্ব হলো, আমি সবার থেকে ৬ মাস আগে 'বায়তুল্লাহ শরীফ' কাবার দিকে মুখ করে নামায আদায় করছি এবং রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধেও অংশ নিয়েছি। তাঁদের এ

www.pathagar.com

আলোচনার পরিপেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। (মুসনাদে আহমদ)

তৃতীয় ঘটনা ঃ হযরত নোমান বিন বসির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে ঘটনাটি ভিন্নভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি একবার এক জুমুয়ার দিন কতিপয় সাহাবার সাথে মসজীদে নববীর মিম্বরের পাশে বসা ছিলেন। উপস্থিত একজন বলেন, ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজিদের পানি পান করানোর মতো মর্যাদাপূর্ণ আর কোন আ'মল নেই এবং এর মোকাবেলায় আর কোন আ'মলের ধার আমি ধারি না। তার এই দাবি খন্ডন করে অপরজন বললেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার চেয়ে উত্তম আ'মল আর নেই। এভাবে দু'জনের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। তখন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাদের ধমক দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌র মিম্বরের কাছে পন্ডগোল বন্ধ করো এবং জুমুয়ার নামাযের পর স্বয়ং হযরতের কাছে বিষয়টি পেশ করো। তার কথামতো বিষয়টি রাসূল (সঃ) এর কাছে পেশ কর হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং এতে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি পানের উপরে জেহাদকে প্রাধাণ্য দেয় হয়। (সহীহ মুসলিম)

ঘটনা যাই হোক না কেন, আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিলো মুলতঃ মুশরিকদের অহংকার নিবারণের উদ্দেশ্যে। অতঃপর মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটে তার সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থাপিত হয় এসব আয়াত থেকে। যার ফলে শ্রোতারা ধরে নিয়েছে যে, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত সূরার নামকরণ, নাযিল হবার সময়কাল, বিষয়বস্তু ও আয়াতগুলোর শানে নূযুল হিসেবে কয়েকটি ঘটনা পেশ করলাম। এখন আমি আপনাদের সামনে আয়াতগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করছি। সূরা তাওবার ১৯ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ط

তোমরা কি হাজিদের পানি পান করানো এবং মসজিদুল হারাম এর রক্ষণাবেক্ষণকে সেই লোকের সমান মনে করো, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি এবংযুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে, এরা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সমান নয়।

www.pathagar.com

আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের দাবি খন্ডন করে যে সত্যটি তুলে ধরা হয়েছে তা হলো, শিরক মিশ্রত আ'মল তা যতো বড় আ'মলই হোক না কেন, তা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং তার কাছে এর কোন মূল্যও নেই। সে কারণে যেমন কোন মুশরিক মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজিদের পানি সরবরাহ দ্বারা মুসলমানদের মোকাবেলায় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে পারে না, তেমনি ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও জিহাদের মর্যাদা 'মসজিদুল হারাম' এর রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজিদের পানি সরবরাহ ও খেদমতের তুলনায় অনেক বেশী। আর যে মুসলমান ঈমান ও জিহাদের দিক দিয়ে অগ্রগামী, সে জিহাদে অনুপস্থিত মুসলমানের চেয়ে আল্লাহ্‌র কাছে অনেক বেশী মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আরব যুগে ঈমান না আনার পরেও কাবা ঘরের মুতাওয়াল্লী বা রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং হজ্জের সময় হাজিদের পানি পান করানো ও খেদমত করাকে তারা বিরাট মর্যাদা ও সম্মানের কাজ মনে করতো এবং এ জন্যে তারা মুসলমানদের সামনে গর্ববোধ করতো। এমনকি মুসলমান হওয়ার পরেও কারো কারো মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিলো। বর্তমান যুগেও আমরা দেখি মসজিদের মুতাওয়াল্লী হওয়া, দরগা ও খানকার গদ্দীনশীল হওয়া, উহার সেবায়েত ও খাদেম হওয়া এবং এই ধরণের প্রদর্শণীমূলক কতিপয় ধর্মীয় কাজকর্ম ও অনুষ্ঠান পালন করাকে তারা বিরাট মর্যাদা, সম্মান ও সওয়াবের কাজ মনে করে থাকে। অথচ আল্লাহর কাছে এসব কাজের কোনই মূল্য বা মর্যাদা নেই। আল্লাহ্‌র কাছে প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা আছে তাদেরই এবং সেই কাজে যারা প্রকৃত ঈমানদার এবং আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জান মাল দিয়ে জিহাদ করে, আন্দোলন-সংগ্রাম করে। সূরা আলে ঈমরানে মহান আল্লাহ্‌ বলেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ○

তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, এমনি এমনি জান্নাতে চলে যাবে? অথচ এখনো আল্লাহ্‌ দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে কে তার পথে (দ্বীন কায়েমের জন্য) জিহাদ (আন্দোলন)করেছে এবং কে কে তাঁর জন্য সবরকারী ।

(আলে ঈমরান-১৪২)

সুতরাং আল্লাহ্‌র কাছে বেশী মর্যাদাবান ও সম্মানের লোক তারাই যারা মজবুত

www.pathagar.com

ঈমানের অধিকারী এবং নিজের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদকারী। যদিও তারা কোন পীরের গদ্দীনশীল নয়, কোন মসজিদের মুত্তাওয়াল্লী নয়। কোন খানকা বা মাজারের সেবায়েত বা খাদেম নয় এবং যদিও তাদের তেমন কোন বংশীয় পরিচয় ও মর্যাদা নেই।

অত্র আয়াতের শেষে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

আর আল্লাহ্ যালেম লোকদের হেদায়াত করেন না। অর্থাৎ ঈমান যে সব আমল বা কাজের মূল ও সব এবাদত-বন্দেগী থেকে উত্তম এবং জিহাদ যে মসজিদ আবাদ ও হাজীদের পানি পান করান এবং খেদমত থেকে উত্তম, তা কোন সুক্ষ্ম তত্ত্ব বা দুর্বোধ্য বিষয় নয়, বরং অত্যন্ত পরিস্কার ও স্পষ্ট কথা। কিন্তু আল্লাহ্ যালেম লোকদের হেদায়াত ও উপলব্ধি শক্তি দান করেন না, বিধায় তারা একটি সাদা-সিধে সোজা কথাকে নিয়েও কু-তর্কে জড়িয়ে পড়ে। ফলে তাদের ভাগ্যে হেদায়াত জুটে না।

পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্পাক বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ–

যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জেহাদ করেছে। তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ্র কাছে। আর তারাই সফলকাম।

এই আয়াতটিতে উপরের আয়াতে উল্লেখিত শব্দ لَا يَسْتَوِىْ 'সমান নয়' এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্র পথে মাল ও জান দিয়ে জেহাদ করেছে, আল্লাহ্র কাছে রয়েছে তাদের বড় মর্যাদা-সম্মান এবং তারাই সফলকাম।

মুশরিকদের মধ্যে যারা কাবা ঘরের খেদমত এবং হাজীদের পানি পান করানকে মর্যাদার দাবীদার এবং সফলকামী মনে করতো। আসলে ঈমান না আনার কারণে ঐসব প্রদর্শনীমূলক বা লোক দেখানো খেদমত ও কাজের আল্লাহ্র কাছে কোন মর্যাদা নেই ও প্রতিদানও নেই। আর ঈমান আনার পর পূর্বের

www.pathagar.com

ঐসব খেদমত ও কাজকে মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গর্ববোধ করা অমূলক ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং মর্যাদা ও প্রতিদান লাভের আমলই হলো আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি মজবুত ঈমান আনা এবং ঈমান আনার পর আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের মাল-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করা, আন্দোলন করা। প্রয়োজনে নিজের ঘর-বাড়ি ও দেশের মহব্বত ত্যাগ করে হিজরত করা।

অতঃপর পরবর্তী দু'টি আয়াত অর্থাৎ ২১ ও ২২ নম্বর আয়াতে খাঁটি মুমিন, জিহাদ ও হিজরত কারীদের পারলৌকিক সফলতা ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ-

তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার তাঁর রহমত তথা দয়া ও সন্তুষ্টির এবং জান্নাতের। সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কাছে আছে বড় পুরস্কার।

উপরোক্ত দুটি আয়াতে জিহাদ ও হিজরতের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এর জন্য প্রিয় মাতৃভূমি নিজের দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মহব্বতকে বিদায় জানাতে হয় এবং আত্মত্যাগ করতে হয়। আর এসব স্বভাবধর্মী মহব্বত ও আত্মত্যাগ করা মানুষের জন্য বড়ই কঠিন কাজ। আর যারাই এই কঠিন কাজটি আনজাম দিতে পারে তাদেরকেই আল্লাহ্পাক পরকালে বিশেষ মর্যাদা এবং পুরস্কার দান করেন।

পরবর্তী আয়াতে মানুষের বৈষয়িক জিনিসকে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসার নিন্দা করে হিজরাত ও জিহাদের জন্য মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করে বলা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের বাপ-ভাইদের বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে

www.pathagar.com

গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে বেশী ভালবাসে। তোমাদের মধ্যে যেসব লোক এ ধরনের লোকদেরকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী।

মাতা-পিতা, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষার তাগাদা কোরআন ও হাদীসে বহু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য এই আয়াতে সম্পর্কের একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, তোমাদের বাপ-ভাইসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যদি ঈমানের চেয়ে কুফরীকে বেশী অগ্রাধিকার দেয়, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের চেয়ে তাগুত তথা কুফরী শক্তিকে বেশী ভালবাসে তাহলে তাদের বন্ধু, হিতাকাংখী বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। তাদের ভালবাসা ও মহব্বতকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কেননা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সকল সম্পর্কের উপর আল্লাহ্ ও রাসূলের সম্পর্ক অগ্রগণ্য। এই দু'ই সম্পর্কের মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে মহব্বত ও আত্মীয়তার সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিতে হবে। এটাকে প্রকৃত ঈমানের কাজ বলে মহানবী (সাঃ) নিম্নের হাদীসে উল্লেখ করে বলেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُ كُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَ وَلَادِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ–

তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমাদের কাছে তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হবো। (বুখারী মুসলিম)

শুধু এটা ঈমানের কাজই নয় বরং পরিপূর্ণ ঈমানের কাজ উল্লেখ করে মহানবী (সাঃ) অন্য হাদীসে বলেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَ مَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَان

যে ব্যক্তি কারো সাথে বন্ধুত্ব রেখেছে শুধু আল্লাহ্র জন্যে, শত্রুতা রেখেছে তাও আল্লাহ্র জন্যে, অর্থ খরচ করেছে আল্লাহ্র জন্যে এবং অর্থ খরচ থেকে বিরত রয়েছে তাও আল্লাহ্র জন্যে, সে যেন নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে। (বুখারী)

www.pathagar.com

উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ জামায়াত হিসেবে সাহাবায়ে কেরাম যে মর্যাদা লাভ করেছেন, তার মূলে রয়েছে তাঁদের এ ত্যাগ ও কূরবানী। তাঁরা সর্বক্ষেত্রে এবং সকল অবস্থায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাই আফ্রিকার হযরত বেলাল (রাঃ), রোমের সোয়াইব (রাঃ), পারস্যের হযরত সালমান ফারসী (রাঃ), মক্কার কোরাইস ও মদীনার আনসারগণ গভীর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং বদর ও ওহুদ যুদ্ধে বাপ ও ছেলে এবং ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে প্রচন্ড অস্ত্রের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন।

তবে হ্যাঁ কোরআন এবং হাদীসে বাপ-ভাই, ছেলে-মেয়ে ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা ছিন্ন করার যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে তা হলো আদর্শের ভালবাসা। দুনিয়ার ক্ষেত্রে তাদের সাথে স্বাভাবিক ব্যবহার করতে হবে এবং মানুষের যে অধিকার আছে তা আদায় করতে হবে।

সূরা লোকমানে এ সম্পর্কে একটি নীতিমালা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَإِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا–

আর তারা (বাপ-মা) যদি তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে চাপ দেয়– যে ব্যাপারে তোমার কিছু জানা নেই, তাহলে তুমি তাদের সেই নির্দেশ মানবে না। তবে দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে অবশ্যই ভাল ব্যবহার করবে। (সূরা লোকমান১৫)

হাদীসেও রাসূল (সাঃ) আদর্শের ভালবাসার কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ–

তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ তার মন ও প্রবৃত্তি আমার উপস্থাপিত আদর্শের অনুগত ও অনুসারী না হবে। (সরহে সুন্নাহ)

সুতরাং আদর্শের ব্যাপারে কারো সাথে আপোষ করা যাবে না। ঈমানের বিষয়ে কাকেও ছাড় দেয়া যাবে না।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

www.pathagar.com

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ نِ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ–

(হে নবী! মোমিনদের) বলো, তোমাদের কাছে যদি তোমাদের বাপ-দাদা, তোমাদের ছেলে-মেয়ে, তোমাদের ভাই-বোন, তোমাদের স্ত্রীরা ও তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা হয়ে যাওয়ার ভয় করো, আর তোমাদের সেই ঘর-দোর যাকে তোমরা খুবই পছন্দ করো– আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় বা ভালবাসার হয়, তাহলে অপেক্ষা করো আল্লাহ্র চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ্ ফাসেক লোকদের কখন-ই পছন্দ করেন না।

সূরা তাওবার এই ২৪ নম্বর আয়াতটি নাযিল হয় মূলতঃ ওদের ব্যাপারে যারা হিজরাত ফরয হওয়াকালে মক্কা থেকে হিজরাত করেনি। বাপ-মা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিজন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধন-সম্পদ ও বাড়ী-ঘরের মায়ায় হিজরাতের ফরজিয়াত থেকে এদেরকে বিরত রেখেছিল।

আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে মানুষের কাছে খুবই প্রিয় ও আকর্ষণীয় মোট ৮টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে ৫টি হলো পাত্রগত। আর ৩টি হলো বস্তুগত। ৫টি পাত্রগত বাপ-মা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন স্ত্রী পরিজন এবং অন্যান্য আত্মীয়। বস্তুগত ৩টি জিনিস হলো– ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বাসগৃহ। আল্লাহ্ তাআলা মানুষের কাছে দুনিয়াবি এসব পাত্রগত ও বস্তুগত জিনিসকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও লোভাতুর করে তৈরী করেছেন। আর এসব লোভাতুর, আকর্ষণীয় ও প্রিয় জিনিসকেই আল্লাহ্ মানুষের জন্য পরীক্ষার বস্তু বানিয়ে দিয়েছেন। যেভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে প্রিয় পাত্র ইসমাইলকে কুরবানীর মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন। মহানবী (সাঃ)কে নিজের প্রিয় মাতৃভূমি

www.pathagar.com

মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরাত করিয়েছিলেন। আর হিজরাত করতে হলে তো উপরে উল্লেখিত ৮টি পাত্রগত ও বস্তুগত সকল কিছুই ত্যাগ করতে হয়। যেমন– প্রয়োজনে বাপ-মা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনের মায়া ত্যাগ করতে হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বাড়ী-ঘর ছাড়তে হয়। দুনিয়ার ধন-সম্পদ মোহযুক্ত ও ভালবাসার বস্তুর চেয়ে যদি আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলকে বেশী মহব্বত করতে হয়, তা হলে তার পথে জিহাদ করতে হয়। আর জিহাদ করলে প্রয়োজনে হিজরাত করতে হয়। আর হিজরাত করলে উপরে উল্লেখিত সকল জিনিসের ত্যাগ-কুরবানী করতে হয়। আর যারাই এই ত্যাগ ও কুরবানী করতে পারে না তাদের দ্বারাই দুনিয়ার ঐসব লোভাতুর ও আকর্ষণীয় জিনিসের মহব্বতে ডুবে গিয়ে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের মহব্বত উপেক্ষিত হয়। আর যারা জিহাদ ও হিজরাত থেকে দূরে সরে যায়, তাদেরই পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ পাক সতর্ক বানী উচ্চারণ করে বলেন–

فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط

তাহলে তোমরা অপেক্ষা কারো আল্লাহর সিদ্ধান্ত বা ফয়সালা আসা পর্যন্ত।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার যে কথা বলা হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি মতামত রয়েছে। যেমন–

এক. হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এখানে 'বিধান' অর্থ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মক্কা বিজয়ের আদেশ। তার দৃষ্টিতে বাক্যের সারমর্ম হলো এই, যারা দুনিয়াবী সম্পর্কের জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, তাদের করুণ পরিণতির দিন সমাগত। মক্কা যখন বিজয় হবে আর এসব নাফরমানেরা লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হবে, তখন দুনিয়াবী সম্পর্ক তাদের কোন কাজে আসবে না।

দুই. হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এখানে 'বিধান' অর্থ আল্লাহ্র আযাবের বিধান। অর্থাৎ আখেরাতের সম্পর্কের উপর যারা দুনিয়ার সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে হিজরাত থেকে বিরত রয়েছে, আল্লাহ্র আযাব অতি শীঘ্রই তাদেরকে গ্রাস করবে। দুনিয়াতেই এই আযাব আসতে পারে। না হলে আখেরাতের আযাব তো আছেই। এখানে হুঁশিয়ারী উচ্চারণটি মূলতঃ হিজরাত না করার প্রেক্ষিতে। কিন্তু আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে জেহাদের। যা নাকি হিজরাতের পরবর্তী পদক্ষেপ। এই বর্ণনা ভঙ্গীর মাধ্যমে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, সবেমাত্র হিজরাতের নির্দেশ দেয়া হলো, এতেই অনেকের হাঁপ ছেড়ে বসার অবস্থা।

www.pathagar.com

কিন্তু অচিরেই আসছে জিহাদের নির্দেশ, যে নির্দেশ পালন করত যেয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্যে সকল জিনিসের মায়া-মহব্বত, এমনকি নিজের জীবনের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করতে হতে পারে।

তিন. মাওঃ মওদুদী (রঃ) বলেন, এখানে বিধান বা ফয়সালা অর্থ– পদচ্যুতি। অর্থাৎ তোমাদের এই ব্যর্থতার জন্য তোমাদেরকে পদচ্যুত করে সত্যিকারে দ্বীনদার এবং দ্বীনের ব্যাপারে নেতৃত্বের অধিকারী, হেদায়াতের মর্যাদার অধিকারী অপর কোন দল বা লোকের হাতে আল্লাহ্ তাআলা দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

মোট কথা উপরের মতামত থেকে আল্লাহ্র চূড়ান্ত ফায়সালা বা বিধান আসার অর্থ এটা বোঝা যায় যে, যারা দুনিয়ার এই পাত্রগত ও বস্তুগত জিনিসের লোভে ও মহব্বতে ডুবে গিয়ে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের ভালবাসা ও মহব্বতকে উপেক্ষা করে এবং জিহাদ ও হিজরাত থেকে বিরত থাকে, তাদের জন্যে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জীবনে কঠিন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও ভয়াবহ আযাব নিহিত রয়েছে। যার পাকড়াও হতে তারা কেউই রেহাই পাবে না এবং তা থেকে দোআ করেও উদ্ধার পাওয়া যাবে না। এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ

لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ-

অবশ্য অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বারণ করবে। নচেৎ তোমাদের উপর শ্রীঘ্রই আল্লাহ্র আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা (আল্লাহ্র এই আযাব থেকে বাঁচার জন্য) দোআ করতে থাকবে। কিন্তু তোমাদের দোআ কবুল করা হবে না। (তিরমিজী)

আয়াতের শেষাংসে বলা হয়েছে-

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ **আর আল্লাহ্ ফাসেক লোকদের হেদায়াত করেন না।**

এখানে বলা হয়েছে যে, যারা হিজরাতের নির্দেশ আসার পরেও দুনিয়াবী সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে আত্মীয়-স্বজন এবং ধন-সম্পদকে বুকে জড়িয়ে বসে

www.pathagar.com

আছে, তাদের এই আচরণ দুনিয়াতে কোন ফল দেবে না এবং আত্মীয়-স্বজন দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় নিজ ঘরে আরাম-আয়েশ ও ভোগের যে আশা পোষণ করে আছে, তাও পূরণ হবে না; বরং জেহাদের দামামা বেজে উঠার পর সকল সহায়-সম্পত্তি তাদের জন্যে অভিষাপ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ আল্লাহ্‌র নিয়ম হলো, তিনি কোন নাফরমান লোকদের অসৎ উদ্দেশ্য পূরণ করেন না।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! আমরা যদি আমাদের সমাজের লোকদের দিকে একটু চোখ বুলিয়ে দেখি, তাহলে তো আমরা তাই দেখতে পাই। বর্তমানে আমাদের এই সমাজে আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠিত নেই, যার ফলে গোটা সমাজ আজ অন্যায়, অপরাধ ও পাপাচারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে! চারিদিকে অশান্তি আর অশান্তি। আর এই অবস্থায় মুসলমান নামধারীরা গুটি কয়েক নেক আমল করে নিজেকে পাক্কা মুসলমান হিসেবে দাবী করছে। অথচ তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত ও ভালবাসাকে উপেক্ষা করে দুনিয়ার মহব্বতে ডুবে আছে। সমাজ পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। তারা অন্ধ-বধির। এতটুকুও তাদের অন্তরের অনুভূতিতে ধরা পড়ে না। তাদের চোখে যেন কিছুই দেখে না। মানুষ আজ বেখেয়াল উদাসীন। সস্তা আমলের প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ। আর এসব দুনিয়া প্রীতি, আত্মভোলা উদাসীন মুসলমানের দাবীদারদের জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়া এবং আখেরাতের চরম লাঞ্ছনা ও শাস্তির সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়ে হুশিয়ার করে দিয়েছেন।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা তাওবার ১৯-২৪ আয়াতের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করলাম। এখন উক্ত আয়াত থেকে আমাদের জন্যে যেসব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

● ঈমান বিহীন আমল, বিশেষ করে শিরক মিশ্রিত আমল আল্লাহ্‌র কাছে কোন মূল্য নেই। সেসব আমল দেখতে যতই নেক ও উত্তম মনে হোক না কেন।

● কোন বেঈমান কাফের, মুশরিক যদি কোন ভাল, কল্যাণকর আমল বা কাজ করে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াতেই তার বিনিময় দিয়ে আখেরাতের শাস্তির পথকে পরিস্কার করে দেন।

www.pathagar.com

● ঈমানদারদের মধ্যে যারা শুধু ঈমান এনে দ্বীনের খেদমত করে, আর যারা ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে তারা উভয়ে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সমান নয়। আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হলো তারাই যারা ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের মহব্বতের জন্য দ্বীন-প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক থেকে নিজের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে।

● যারা দ্বীন-প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক না হয়ে শুধু কিছু দ্বীনি খেদমত এবং কতিপয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে নিজেকে পাক্কা মুসলমান দাবী করে কু-তর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে, আল্লাহ্‌ পাক তাদেরকে যালেম বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর এদেরকেই আল্লাহ্‌পাক সঠিক পথ দেখান না।

● প্রকৃত পক্ষে দুনিয়া ও আখেরাতে তারাই সফলকাম এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাদেরই মর্যাদা রয়েছে, যারা ঈমান আনার পর নিজের জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে, আন্দোলন করে এবং প্রয়োজনে দ্বীনের খাতিরে বাড়ী-ঘর ও প্রিয়জনদের মহব্বত ত্যাগ করে হিজরাত (দেশ ত্যাগ) করে।

● জিহাদ এবং হিজরাতকারী খাঁটি ঈমানদারদের মহা পুরুস্কার হিসেবে আল্লাহ্‌ তাবারাকওয়া তায়ালা যেসব প্রতিদান দেবেন, তা হলো– ক) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বা দয়া। খ) তাঁর সন্তুষ্টি। গ) চির প্রশান্তিময় জান্নাত ঘ) এবং স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য বালাখানা।

● জিহাদকারী মুমিন লোকেরা কখনই কুফরকারী অথবা কুফুরি শক্তির অনুসারী বাপ-দাদা, ভাই-বোন ও অন্যান্য নিকট স্বজনদের বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে না। যদি কেউ তা করে তবে তারা হবে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ফাসেক বা সীমালংঘনকারী।

● আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র রাসূল এবং জিহাদের মোকাবেলায় যদি নিজের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের পক্ষ অবলম্বন করতে হবে এবং সমস্ত আপন জনের মহব্বত ত্যাগ করে প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে। যেভাবে বদরের যুদ্ধে হযরত আবুবকর তার কাফের ছেলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

● নিজের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বাড়ী-ঘরকে প্রিয় ও মহব্বতের জিনিস বানানো যাবে না। বরং প্রিয় ও মহব্বতের জিনিস বানাতে হবে– আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁরপথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ বা আন্দোলন করাকে। আর যদি এটা করতে কেউ ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আর যখন এ শাস্তি এসে হাজির হয়ে যাবে তখন সবাই মিলে দোআ করলেও তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা তাওবার ১৯-২৪ আয়াত পর্যন্ত যে দারস এবং শিক্ষা পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, সেজন্য মহান আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর উক্ত দারস থেকে আমরা যেসব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে দারস শেষ করছি। মাআসসালাম।

www.pathagar.com

দুই

কতিপয় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। ওয়াদা এবং কসম রক্ষা করার গুরুত্ব।

(সূরা নহল-৯০-৯৭ আয়াত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ- وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ط اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ- وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ م بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ط تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا م بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِىَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ط وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ- وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ط وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ- وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ

www.pathagar.com

سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ- وَلاَ تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ط وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَ حْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে– (৯) আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে সুবিচার, ইনসাফ, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বনজকে দান করার নির্দেশ দেন। আর অশ্লীলতা, পাপ কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে নসীহত করছেন যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ করতে পারো। (৯১) তোমরা আল্লাহ্র ওয়াদা পূরণ করো, যখন তোমরা তাঁর নিকট কোন ওয়াদা করো এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভংগ করো না। অথচ তোমরা আল্লাহ্কে জামিনদার বানিয়ে নিয়েছ। তোমরা যে কাজ-কাম করো আল্লাহ্ তা সবকিছুই জানেন। (৯২) তোমাদের অবস্থা যেন সেই মহিলার মতো না হয়, যে নিজেই খাটা-খাটুনি করে সুতা কাটে এবং পরে নিজেই ওকে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলে। তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পারস্পরিক ব্যাপারে ধোকা ও প্রতারণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছো এজন্য যে, যাতে একদল অপর দল অপেক্ষা বেশী ফায়দা লাভ করতে পারে। অথচ আল্লাহ্ এই ওয়াদা- প্রতিশ্রুতির দ্বারা তো তোমাদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। আর অবশ্যই তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদের পারস্পরিক কলহের মূল তত্ত্ব তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেবেন। (৯৩) আল্লাহ্ যদি এটাই চাইতেন (যে, তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ হবে না) তবে তিনি তোমাদেরকে একই জাতিতে পরিণত করে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে চান সত্য-সঠিক পথ দেখান। আর তোমরা যা করো সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা

www.pathagar.com

হবে। (৯৪) (হে মুমিনেরা!) তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে ধোকা দেবার উপায় বানিয়ে নিও না। তা হলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং তোমরা খারাপ পরিণতি দেখতে পাবে এই কারণে যে, তোমরা আমার পথ হতে ফিরিয়ে রেখেছ এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে। (৯৫) তোমরা আল্লাহ্‌র ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিকে সামান্য ফায়দার বিনিময়ে বিক্রয় করে দিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা তোমাদের জন্যে অতি উত্তম– যদি তোমরা জানতে ও বুঝতে। (৯৬) তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, তা সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তাই চিরদিন থাকবে। আমি অবশ্যই ধৈর্য ধারণকারীদেরকে তাদের উত্তম-ভাল কাজের অনুপাতে প্রতিফল দান করবো। (৯৭) যে ব্যক্তিই নেক আমল করবে– সে পুরুষ হোক কিংবা নারী– যদি সে মুমিন হয়, তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন যাপন করাব। আর (পরকালে) এ ধরণের ব্যক্তিদের তাদের আমল অনুপাতে প্রতিফল দান করবো।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اِنَّ –নিশ্চয়। يَأْمُرُ –নির্দেশ দেন। بِالْعَدْلِ –ইনসাফ বা ন্যায় বিচারের। اِحْسَانٍ –সদাচারণ, সহানুভূতি। اِيْتَائِ –দান করার। ذِى الْقُرْبٰى–আত্মীয়-স্বজন। يَنْهٰى –নিষেধ করেন। عَنْ––থেকে বা হতে। اَلْفَحْشَاءِ–অশ্লীলতার। اَلْمُنْكَرِ –অপছন্দনীয় বা পাপ কাজের। اَلْبَغْىِ–অবাধ্যতার। يَعِظُكُمْ–তোমাদেরকে নসিহত করেন। لَعَلَّكُمْ –সম্ভবত তোমরা। تَذَكَّرُوْنَ –স্মরণ করবে বা শিক্ষা লাভ করবে। اَوْفُوْا –তোমরা পূর্ণ করো। بِعَهْدِ اللّٰهِ– আল্লাহ্‌র ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি। اِذَا–যখন। عٰهَدْتُّمْ–তোমরা ওয়াদা- প্রতিশ্রুতি করো। لَا تَنْقُضُوْا- –তোমরা ভঙ্গ করো না। اَيْمَانَ –কসম সমূহ। بَعْدَ –পরে। تَوْكِيْدِهَا–পাকা-পাকি করা। جَعَلْتُمُ اللّٰهَ–আল্লাহ্‌কে

www.pathagar.com

করেছ। عَلَيْكُمْ- –তোমাদের উপর। كَفِيْلًا –জামিনদার। يَعْلَمُ –জানেন। تَفْعَلُوْنَ- مَا- –যা তোমরা করো। لَا تَكُوْنُوْا –তোমরা হয়ে যেও না। كَالَّتِيْ –ঐ মহিলার মতো। نَقَضَتْ–যে সূতা কেটেছে। غَزْلَهَا–তার সূতা। بَعْدِ–পরে। قُوَّةٍ–মজবুত করার تَتَّخِذُوْنَ –তোমরা গ্রহণ করো। اَنْكَاثًا -টুকরো টুকরো। بينكم–তোমাদের পরস্পরের মধ্যে। اُمَّةٌ–একদল। هِيَ -তা। اَرْبٰى- বেশী লাভবান يَبْلُوْكُمُ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। بِهٖ–তা দ্বারা। لَيُبَيِّنَنَّ –অবশ্যই প্রকাশ করবেন। لَكُمْ –তোমাদের জন্য। يَوْمَ الْقِيٰمَةِ –কিয়ামতের দিন বা পরকালে। مَا –যা। كُنْتُمْ - তোমরা করেছিলে। فِيْهِ– উহাতে। تَخْتَلِفُوْنَ –তোমরা মতানৈক্য করতে। لَوْ –যদি। - شَاءَ চাইতেন বা ইচ্ছা করতেন। لَجَعَلَكُمْ –তোমাদের করে দিতেন। اُمَّةً وَّاحِدَةً –একই দলভুক্ত। لٰكِنْ –কিন্তু, বরং। يُضِلُّ–তিনি পথভ্রষ্ট করেন। مَنْ يَّشَاءُ–যাকে চান। وَيَهْدِيْ –এবং হেদায়াত দেন। لَتُسْئَلُنَّ –অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন। عَمَّا -তা সম্পর্কে। لَا تَتَّخِذُوْا –তোমরা গ্রহণ করো না। اَيْمَانَكُمْ–তোমাদের কসম সমূহ। دَخَلًا –ধোকা। فَتَزِلَّ –অতঃপর ফসকে যাবে। قَدَمٌ–পা। بَعْدَ –পরে। ثُبُوْتِهَا–তা দৃঢ় মজবুত। تَذُوْقُوا-–তোমরা স্বাদ নেবে السُّوْءَ –খারাপ। صَدَدْتُّمْ–তোমরা বাধা দিতে। عَنْ–থেকে বা হতে। سَبِيْلِ اللّٰهِ–আল্লাহ্র পথ। لَكُمْ –তোমাদের জন্যে। عَذَابٌ –শাস্তি।

www.pathagar.com

عَظِيْمٌ –বড়, মহাকঠিন। لَا تَشْتَرُوا –তোমরা খরিদ বা বিক্রী করো না। بِعَهْدِ اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার। ثَمَنًا –মূল্যে। قَلِيْلًا–অল্প, সামান্য। هُوَ–উহা বা তাই। خَيْرٌ –উত্তম। اِنْ كُنْتُمْ–যদি তোমরা। تَعْلَمُوْنَ –জানতে বা বুঝতে। مَا عِنْدَكُمْ –তোমাদের কাছে যা আছে। يَنْفَدُ –নিঃশেষ হয়ে যাবে। بَاقٍ –অবশিষ্ট বা স্থায়ী। لَنَجْزِيَنَّ –অবশ্যই প্রতিদান দেয়া হবে। اَلَّذِيْنَ–যারা। صَبَرُوا –ধৈর্য ধারণ করেছে। اَجْرَهُمْ –তাদের প্রতিদান। بِاَحْسَنِ –অতি উত্তম। مِن ذَكَرٍ –পুরুষদের। عَمِلَ صَالِحًا–যে সৎ আমল করবে। اُنْثٰى–নারীদের। هُوَ مُؤْمِنٌ –তারা মুমিন। فَلَنُحْيِيَنَّهٗ –অতঃপর তাদেরকে জীবন দেব আমরা। حَيٰوةً طَيِّبَةً –পবিত্র জীবন। مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ–যা তারা আমল বা কাজ করতো।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে দারস পেশ করার জন্য সূরা নহলের ৯০ থেকে ৯৭ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত ও তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিক ভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। 'অমা তাওফীকি ইল্লাহ্ বিল্লাহ্'।

সূরার নামকরণ ঃ 'নাহল' অর্থ মৌমাছি। সূরার ৬৮ নম্বর আয়াতে وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ- বাক্যাংশ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে। এই নামকরণ সূরার শিরোনাম হিসেবে করা হয়নি। বরং প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। তবে যা করা হয়েছে তা অহীর নির্দেশেই করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল ঃ সূরাটি মাক্কী এ বিষয়ে সবাই একমত। তবে মক্কী জীবনের কোন সময় অবতীর্ণ হয় এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও সূরাতে উল্লেখিত কয়েকটি ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সূরাটি মহানবী (সাঃ) এর মক্কী জীবনের শেষের দিকে নাযিল হয়। যেমন– সূরার ৪১ নম্বর আয়াত হতে বুঝা যায় যে, এসময় হাবশায় হিজরাত অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। তাছাড়া ১০৬ নম্বর আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, এসময় মুসলমানদের উপর কাফেরদের যুলুম-নির্যাতন চরম ভাবে বেড়ে গিয়েছিলো। তাছাড়া ১১২-১১৪ নম্বর আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সাঃ) এর নবুয়াত লাভের পর মক্কায় যে বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো এ সূরা নাযিলের সময় তা শেষ হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং এসব প্রমাণ থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে সূরাটি মাক্কী জীবনের শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাছাড়া সূরাটির সাধারণ বর্ণনাভংগিও একথা সমর্থন করে।

সূরাটির মূল বিষয়বস্তু ঃ সূরাটির মূল বিষয়বস্তু হলো– শিরককে বাতিল করে তাওহীদ বা একত্ববাদকে প্রমাণ করা, নবীজির ডাকে সাড়া না দেবার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা ও উপদেশ দেয়া এবং হকের বিরোধিতা ও তার পথে বাধা সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু ঃ দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর মূল বিষয় হলো– আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিছু ভালো কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজে বাধা সৃষ্টি করা। তাছাড়া আল্লাহ্‌র সাথে অংগীকর ও কসম রক্ষা করার প্রতিদান এবং ভঙ্গ করার পরিণতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সবরকারী এবং সৎ আমলকারী পুরুষ-নারীদের দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরাটির প্রাথমিক কিছু পরিচয় তুলে ধরলাম। এখন আমি উল্লেখিত আয়াতগুলোর ধারাবাহিক ভাবে ব্যাখ্যা পেশ করছি। মহান আল্লাহ্ পাক অত্র সূরার ৯০ আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ–

www.pathagar.com

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা, ন্যায় বিচার, সদাচারণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর বারণ করছেন অশ্লীলতা, পাপ কাজ ও অবাধ্যতা থেকে। তিনি তোমাদেরকে নসিহত করেন, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পার।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এই আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ এটি হচ্ছে আল কুরআনের ব্যাপক অর্থবোধক একটি আয়াত। (ইবনে কাসীর)

এই আয়াতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়ের আদেশ এবং তিনটি কাজের নিষেধ করা হয়েছে যা নাকি একটি সমাজকে সুন্দর, সুশৃংখল এবং শান্তিময় করে গড়ে তোলে।

আদেশ সূচক তিনটি বিষয় ঃ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের আদেশ সূচক তিনটি বিষয়ের **প্রথম আদেশ ঃ** عَدَل (আদল), عَدَل (আদল) শব্দের আভিধানিক অর্থ ন্যায় বিচার করা, ভারসাম্য রক্ষা করা ও কোন কিছু সোজা করা। আর ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ হলো, ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের সকল ক্ষেত্রে শরীয়ত সম্মত জীবন বিধানে যার যা হক বা প্রাপ্য তা আদায়ের সুব্যবস্থা করা।

'আদল' দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। একটি হলো আল্লাহ্র প্রতি আদল এবং অপরটি হলো বান্দার প্রতি 'আদল'।

আল্লাহ্র প্রতি আদল ঃ আল্লাহ্র প্রতি আদল অর্থ حَقُّ اللّٰه অর্থাৎ আল্লাহ্র হক বা অধিকারকে সঠিকভাবে আদায় করা। আল্লাহ্র হককে নিজের ভোগবিলাসের উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের কামনা-বাসনার উপর অগ্রাধিকার দেয়া, আল্লাহ্র বিধানগুলো যথাযথ ভাবে পালন করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ বা হারাম বিষয় ও কাজ থেকে বেঁচে থাকা, দূরে থাকা এবং পরিহার করা।

বান্দার প্রতি আদল ঃ حَقُّ الْعِبَادْ বা বান্দার প্রতি আদলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

(i) ব্যক্তির প্রতি আদল ঃ অর্থাৎ বান্দা নিজের প্রতি আদল করবে। নিজের প্রতি আদল হলো দৈহিক ও আত্মিক ধ্বংসের কারণাদি থেকে নিজেকে বাঁচানো, নিজের এমন কামনা বা চাহিদা পূর্ণ না করা যা পরিনামে ক্ষতির কারণ হয়।

www.pathagar.com

সবর বা ধৈর্য অবলম্বন করা ও অল্পে তুষ্ট হওয়া। আর আল্লাহ্ পাক মানুষের দেহে যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন তার ধারণক্ষমতার বাইরে অহেতুক বোঝা না চাপানো।

(ii) সমাজের অন্যান্য মানুষের প্রতি আদল ঃ সমাজে বসবাসকারী অন্যান্য মানুষের প্রতি পারস্পরিক আদল। যার যা হক বা অধিকার তা বুঝিয়ে দেওয়া। আদলের প্রচলিত যে অর্থ 'ইনসাফ' আমরা করে থাকি তা প্রকৃত অর্থে ভুল। কেননা, اِنْسَافْ (ইনসাফ) শব্দটি نِصْفٌ (নেছফুন) শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ-অর্ধ। অর্থাৎ, আধাআধির ভিত্তিতে অধিকার বন্টন করা। এ থেকেই আদল ও ইনসাফের অর্থ মনে করা হয়েছে সাম্য ও সমান সমান ভিত্তিতে অধিকার বন্টন। এটি সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরোধী। তাহলে তো একজন পিতার ছেলে-মেয়ে দুজন সন্তানের মধ্যে সম্পত্তি আধাআধি করে ভাগ করে দিতে হয়, এটা সঠিক নয়। এটা তো আল্লাহ্র দেয়া বিধানের বিপরীত। আসলে 'আদল' সমতা বা সাম্য নয় বরং ভারসাম্য রক্ষা ও সমন্বয় সাধন করা। কোন কোন ক্ষেত্রে 'আদল' অবশ্যই সমাজের লোকদের মধ্যে 'সাম্য' চায়। যেমন নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে সবাই সমান। বিচারকের সামনে বাদী-বিবাদী উভয়েই সমান, তা রাজা-প্রজার মধ্যে হোক না কেন। তবে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে 'সাম্য' সম্পূর্ণভাবে 'আদল' বিরোধী। যেমন বাপ মা ও সন্তানদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক সাম্য এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের মধ্যে বেতনের 'সাম্য'। অতএব আল্লাহ্ যে জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন তা অধিকারের মধ্যে 'সাম্য' নয় বরং ভারসাম্য রক্ষা করা ও সমন্বয় সাধন করা। এ হুকুমের দাবী হলো এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে আদায় করা।

দ্বিতীয় আদেশ ঃ اِحْسَانْ (ইহসান), اِحْسَانْ শব্দটি আরবী حُسْنٌ শব্দ থেকে এসেছে। যার আভিধানিক অর্থ সৌন্দর্য। কোনকিছু সুন্দর ও উত্তম রূপে সম্পন্ন করার নাম হলো ইহসান। সাধারণ অর্থে দান করা, সৎ ও কল্যাণকর কাজ করা, উপকার করা ও উত্তম ব্যবহার করাকে ইহসান বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে মানুষের যে দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে তা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে উত্তমভাবে সম্পন্ন করাকে ইহসান বলে। কেউ কেউ

www.pathagar.com

ইহসান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং ইসলামী বিধানের প্রতি এমন গভীর ভালবাসা যা একজন মুসলমানকে ইসলামের জন্য সবকিছুই উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

ইহসানের ক্ষেত্র ঃ ইহসান দুটি ক্ষেত্রে আদায় করা যেতে পারে। যেমন স্রষ্টার প্রতি ইহসান এবং সৃষ্টির প্রতি ইহসান।

ক) স্রষ্টার প্রতি ইহসান ঃ স্রষ্টার প্রতি ইহসানের অর্থ যখন নেয়া হবে তখন তার অর্থ হবে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাঁর যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী করা। ইহসানের সঠিক মর্ম ও তাৎপর্য সাহাবাদেরকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে একবার জিবরাইল (আঃ) মহানবী (সাঃ) এর দরবারে হাজির হয়ে অনেক প্রশ্নের মধ্যে ইহসান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) প্রতি উত্তরে বলেছিলেন,

اَنْ تَعْبُدَاللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ

তুমি এমন ভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে তুমি এরূপ মনে করবে যে, নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন। (মুসলিম)

উল্লেখ্য যে মুসলিম শরীফে বর্ণিত এই হাদীসটি "হাদীসে জিবরীল" নামে পরিচিত। সুতরাং এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র প্রতি ইহসান অর্থই হলো তার ইবাদত বন্দেগী নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে যথাযথ ভাবে পালন করা। কেননা, আল্লাহ্ বান্দার সমস্ত কাজকে অবলোকন করছেন।

খ) সৃষ্টির প্রতি ইহসান ঃ সৃষ্টির প্রতি ইহসান বলতে শুধু মানুষের প্রতিই ইহসান নয় বরং মানুষসহ আল্লাহ্ পাকের যাবতীয় সৃষ্টি জীবের প্রতি ইহসান করা।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবন যাপন মানুষের জাতগত অভ্যাস। সুতরাং একটি সুন্দর সুশৃংখল ও শান্তিময় সমাজের জন্য ইহসানের প্রয়োজন। যেখানে থাকবে পরোপকার, সদাচারণ, ভাল ব্যবহার, সহানুভূতি, ভালবাসা, দয়া, ক্ষমা, অপরের অগ্রাধিকার, পরস্পরের সম্মান-মর্যাদা রক্ষা, অন্যকে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দেয়া এবং নিজের অধিকার আদায়ের বেলায় কম নেয়া। এটি 'আদলের' চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। 'আদল' যদি সমাজকে কটুতা ও তিক্ততা থেকে বাঁচায় তাহলে 'ইহসান' তার মধ্যে সমাবেশ ঘটায় মিষ্ট মধুর স্বাদের।

www.pathagar.com

আর যদি সমাজের লোকেরা এই গুণের সমাবেশ ঘটায় তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ সমাজের লোকদের উপর রহমত নাযিল হয়। মহানবী (সাঃ) হাদীসে উল্লেখ করেন ঃ

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ

তোমরা পৃথিবীতে যা আছে তাদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি রহম করবেন। (তিরমিযী)

এই হাদীস থেকে এও জানা যায় যে, মানুষের প্রতিই শুধু ইহসান বা দয়া নয়। বরং অন্যান্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জীবের প্রতিও ইহসান বা দয়ার কথা বলা হয়েছে। বুখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীসের বর্ণনায় পাওয়া যায় বনি ইসরাইলের একজন মহা পাপী পতিতা মহিলা একটি অসহায় পিপাসার্ত কুকুরের প্রতি সদয় হয়ে পানি পান করানোর কারণে আল্লাহ্ পাক খুশী হয়ে তার অপরাধ ক্ষমা করে জান্নাত দান করেছিলেন।

সুতরাং যদি স্রষ্টা এবং সৃষ্টির প্রতি ইহসান করা হয় তাহলে সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে যেমন প্রশান্তি বিরাজ করবে তেমনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেও ক্ষমা, দয়া এবং ভালবাসা প্রদর্শিত হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ। **তোমরা ইহসান করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইহসানকারীদেরকে ভালবাসেন। (বাকারা-১৯৫)**

তৃতীয় আদেশ ঃ اِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى -আল্লাহ্‌র আদেশের মধ্যে এটি হলো তৃতীয় আদেশ। اِيْتَا শব্দের অর্থ কোন কিছু দেয়া এবং قُرْبٰى শব্দের অর্থ আত্মীয়তা। ذِى الْقُرْبٰى শব্দের অর্থ আত্মীয়-স্বজন। অতএব وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى এর অর্থ হলো- 'আত্মীয়-স্বজনকে কিছু দেয়া'। কি দিতে হবে এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে সূরা বনি ইসরাইলের ২৬নং আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে- وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ "তুমি তোমার আত্মীয়কে তার হক বা প্রাপ্য দান করো।" এই আয়াতে হক বা প্রাপ্য কিংবা অধিকার শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এখানে কোন প্রাপ্যের ব্যাপারে

www.pathagar.com

নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি। অবশ্য সূরা বাকারার ১৯৯ নম্বর আয়াতে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করে বলা হয়েছে - وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى এবং (তারাই প্রকৃত ধর্মপরায়ন) যারা আল্লাহ্‌র ভালবাসার খাতিরে আত্মীয়-স্বজনকে ধন-সম্পদ দান করে।

অবশ্য দারসের জন্য উল্লেখিত আয়াতে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'হক' বা প্রাপ্যের কথায় বলা হয়েছে, যেখানে ধন-সম্পদও রয়েছে। যেমন আত্মীয়কে তার হক বা প্রাপ্য দিতে হবে। অর্থাৎ অভাবে পড়লে অর্থ-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, বিপদে পড়লে শান্তনা দেয়া এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করা ইত্যাদি সবই উপরোক্ত হক বা প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহসান শব্দের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য দেওয়ার কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের অধিকারের গুরুত্ব অধিক বুঝানোর জন্যে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে আবার নিকটাত্মীয়দেরকে বেশী অগ্রাধিকার দিতে হবে। অর্থাৎ আত্মীয়তার দিক থেকে যে যত বেশী নিকটতম তার প্রাপ্য ততো বেশী।

উপরোক্ত এই তিনটি আদেশ ছিলো ইতিবাচক। অতঃপর তিনটি নিষিদ্ধ কাজ তথা নেতিবাচক নির্দেশে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাদেরকে অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করেছেন। এই নেতিবাচক অসৎ কাজগুলো ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যক্তিকে এবং সামষ্টিক পর্যায়ে সমগ্র সমাজ পরিবেশকে খারাপ করে দেয়।

প্রথম নিষিদ্ধ কাজ ঃ فَحْشَآءِ অর্থাৎ অশ্লীলতা-নির্লজ্জতা। এটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সব রকমের অশালীন, নোংরা, ঘৃণ্য, কদর্য ও নির্লজ্জ কথা ও কাজ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেসব কথা ও কাজকে সবাই মন্দ ও খারাপ মনে করে। সমাজ যেসব কথা ও কাজকে স্বীকৃতি দেয় না। যার মাধ্যমে সমাজে অশ্লীলতা ও বেহায়া বেলাল্লাপনা বৃদ্ধি পায়। যার দ্বারা সমাজ কলুষিত হয়, তাকেই বলা হয় - فَحْشَآءِ বা অশ্লীলতা। যেমন কৃপণতা, ব্যভিচার, উলংগপনা, সমকামিতা, মুহাররাম আত্মীয়কে বিয়ে করা, চুরি-ডাকতি, মদ পান, জুয়া, ভিক্ষাবৃত্তি, গালাগালি করা ও কটু কথা বলা ইত্যাদি। এছাড়া সবার

www.pathagar.com

সামনে বেহায়াপনা ও খারাপ কাজ করা এবং খারাপ কাজকে ছড়িয়ে দেয়াও অশ্লীলতা নির্লজ্জতার অন্তরভুক্ত। যেমন মিথ্যা তহমত, মিথ্যা প্রচারণা, গোপন অপরাধ মানুষের কাছে বলে দেয়া, অশ্লীল কাজে প্ররোচনা দেয় এমন গল্প, নাটক, কবিতা, গান, চলচ্চিত্র, উলংগ চিত্র, মেয়েদের সাজগোজ করে মানুষের সামনে আসা, নারী-পুরুষ প্রকাশ্যে মেলামেশা, নাইট ক্লাবে যাওয়া এবং মঞ্চে মেয়েদের নাচগান করা ও বিভিন্ন অংগভংগীর মাধ্যমে সুন্দরী প্রতিযোগীতা ও মডেল প্রদর্শনী করা ইত্যাদি সবই فَحْشَآءِ বা "অশ্লীলতা নির্লজ্জতার" মধ্যে গণ্য।

দ্বিতীয় নিষিদ্ধ কাজ ঃ اَلْمُنْكَرْ। অর্থাৎ 'অসৎ কাজ'। এর অর্থ হচ্ছে এমন সব অসৎ কথা ও কাজ যা মানুষ সাধারণ ভাবে খারাপ মনে করে, চিরকাল খারাপ বলে আসছে এবং আল্লাহ্‌র বিধানে যেসব কথা এবং কাজ বলতে ও করতে নিষেধ করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কর্মগত ও চরিত্রগত যাবতীয় গোনাহ্ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তৃতীয় নিষিদ্ধ কাজ ঃ وَالْبَغْيِ অর্থাৎ "সীমালংঘন" করা। এর মানে হলো নিজের 'হদ' বা সীমা অতিক্রম করা এবং অন্যের অধিকার তা আল্লাহ্‌র হোক অথবা বান্দার হোক তা লংঘন করা ও তার উপর হস্তক্ষেপ করা। তবে এর অর্থ যুলুম ও উৎপীড়নও বোঝানো যায়। بَغْيِ এর অর্থ "সীমালংঘন" বা যুলুম-উৎপীড়ন যাই বুঝানো হোক না কেন এর প্রভাব অন্যান্য লোক পর্যন্ত সংক্রমিত হয়। মাঝে মাঝে এই সীমালংঘন পরস্পরের মধ্যে হানাহানি ও যুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়ে যায় অথবা আরও অধিক বৃদ্ধি হয়ে সারা বিশ্বেও অশান্তি সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রিয় ভায়েরা বোনেরা! আলোচ্য আয়াতে যে ছয়টি ইতিবাচক ও নেতিবাচক নির্দেশ দেয়া হয়েছে, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সাফল্যের অমোঘ প্রতিকার বটে।

পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি ও কসম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ঃ

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ

www.pathagar.com

بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا –

তোমরা আল্লাহ্‌র ওয়াদা বা অঙ্গীকার পূরণ করো, যখন তোমরা তাঁর নিকট কোন ওয়াদা করো এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভংগ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহ্‌কে জামিনদার বানিয়ে নিয়েছ।

এই আয়াতে তিন ধরনের ওয়াদা বা অংগীকারের কথা বলা হয়েছে। যা গুরুত্বের কারণে পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা করে সেগুলোকে মেনে চলার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রথম ধরনের অংগীকার ঃ মানুষ আল্লাহ্‌র সাথে যে অংগীকার করেছে। যেমন রুহ জগতে সমগ্র মানব জাতি আল্লাহ্‌র সাথে এভাবে অংগীকারাবদ্ধ হয়– মহান আল্লাহ্ প্রশ্ন করেন– اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ "আমি কি তোমাদের রব নই" ? প্রতিউত্তরে সমস্ত রুহ একই সাথে قَالُوْا بَلٰى তারা বলে হ্যাঁ (অবশ্যই আপনি আমাদের রব)। তাছাড়া দুনিয়াতেও কালেমা পড়ে মুসলিম হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে অংগীকারাবদ্ধ হওয়া। বাইয়াতে আকাবা এবং হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নামে বাইয়াত গ্রহণ বা নিজের জান-মাল ত্যাগ করার অংগীকারে আবদ্ধ হওয়া। সূরা ফাতাহ্-য় মহান আল্লাহ্ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ط يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

(হে নবী!) যারা আপনার (হাতে হাত রেখে) শপথ বা অংগীকার করে, তারা তো আল্লাহ্‌র কাছেই অংগীকার করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর ছিলো। অতএব, যে শপথ ভংগ করে, অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং যে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অংগীকার পূর্ণ করে, অতিসত্তর তাকে আল্লাহ্ মহা পুরস্কার দান করবেন। (সূরা ফাতাহ্-১০)।

www.pathagar.com

অংগীকারের মধ্যে এ ধরনের অংগীকারের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী।

দ্বিতীয় ধরনের অংগীকার ঃ একজন বা এক দল মানুষ অন্য একজন বা একদল মানুষের সাথে যে অংগকিার করে। এই অংগীকার করার সময় আবার আল্লাহ্‌র কসম খায়। অথবা নিজের অংগীকারকে দৃঢ় করার জন্য কোন না কোন ভাবে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে। যেমন– একপক্ষ থেকে অপর পক্ষ একজন বা এক দলের সাথে অংগীকারাবদ্ধ হওয়া। এই ওয়াদা বা অংগীকারের সাথে আবার আল্লাহ্‌র কসমও সংযুক্ত আছে। এসব অংগীকার দ্বীনি কাজ তথা ইসলামী আন্দোলনের জন্য হতে পারে আবার মানুষের বৈষয়িক কাজের জন্যও হতে পারে। এই অংগীকার বা চুক্তির গুরুত্ব দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় ধরনের অংগীকার ঃ আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে যে অংগীকার করা হয়। যেমন বৈষয়িক কোন কাজ– ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে। তাছাড়া এক দেশ অন্য দেশের সাথে ভ্রাতৃসূলভ ও বন্ধুসুলভ সহঅবস্থান এবং উন্নয়নের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকে। এর মধ্যে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হতে পারে, আবার বন্দি বিনিময় চুক্তিও হতে পারে। কিম্বা ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়েও চুক্তি হতে পারে। এই চুক্তি বা অংগীকারের গুরুত্ব উপরের দু'প্রকার অংগীকারের গুরুত্বের পরবর্তী পর্যায়ে। তবে উল্লেখিত সব কয়টি অংগীকার বা চুক্তিই পালন করতে হবে। এর মধ্য থেকে কোনটিই ভেঙ্গে ফেলা বৈধ হবে না। তবে কোন দেশ যদি নিজেই আগে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে তা হলে নিজের দেশ রক্ষার জন্য পূর্বের অবস্থানে ফিরে যেতে পারবে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কার কাফের ও মদীনার ইহুদীদের সাথে কৃত চুক্তি তাদের পক্ষ থেকে ভঙ্গের পরেই তিনি শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।

অতঃপর আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ্ বলেন– إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ **নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত**। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে জামিনদার বানিয়ে তোমরা যেসব ওয়াদা বা অংগীকার অথবা চুক্তি করছো এবং অংগীকার করার পরে তোমাদের অংগীকার অনুযায়ী সমস্ত কার্যকলাপ এমনকি তিনি তোমাদের নিয়তের বিষয়টিও অবগত আছেন।

মহান আল্লাহ্ পরবর্তী আয়াতে মানুষকে সহজে অংগীকার বুঝানোর জন্য উদাহরণ উল্লেখ করে বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ ۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا

তোমাদের অবস্থা যেন সেই মহিলাটির মতো না হয়ে যায়, যে নিজে পরিশ্রম করে (চোরখীতে) সূতা কাটে এবং তারপর নিজেই তা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে।

অর্থাৎ একজন মহিলা যেমন নিজে কঠোর পরিশ্রম করে চোরখীতে সূতা কাটে। অতঃপর নিজেই সেই চোরখীতে কাটা সূতাগুলোকে নিজ হাতে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে, যার ফলে তার পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যায় এবং নিজেই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অনুরূপ ভাবে তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল বা তোমাদের আমীর বা নেতার সাথে ওয়াদাবদ্ধ বা অংগীকারাবদ্ধ হচ্ছো কল্যাণের জন্য, আবার নিজেরাই সেই দৃঢ় অঙ্গীকারকে চোরখীর সূতাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করার মতো ভঙ্গ করে নিজেরাই বড় ক্ষতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হচ্ছো। সুতরাং তোমাদের এই কৃত দৃঢ় ওয়াদা বা অংগীকার নিজেরাই ভঙ্গ করে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতকে ধ্বংস করে দিচ্ছো।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা পরবর্তী আয়াতে বলেন–

تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا ۢ بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِىَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ۭ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ۭ

তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পারস্পরিক ব্যাপারে ধোকা ও প্রতারণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেছো এই জন্য যে, একদল অন্যদল অপেক্ষা বেশী ফায়দা লাভ করতে পারবে। অথচ আল্লাহ্ এই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির দ্বারা তো তোমাদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চান।

এই আয়াতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের অংগীকার ভঙ্গের নিন্দা করা হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কোন দল, দেশ বা জাতির সাথে তোমাদের চুক্তি হয়ে গেলে পার্থিব সাময়িক স্বার্থ ও উপকারের জন্যে সে চুক্তি ভঙ্গ করবে না। কেননা, এ ধরনের চুক্তি ভঙ্গ দুনিয়ায় বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, দল বা পার্টি অথবা দেশ বা জাতির সাথে চুক্তি হয়েছে, যারা দুর্বল ও সংখ্যায় কম কিম্বা আর্থিক দিক দিয়ে নিঃস্ব, তাদের

www.pathagar.com

বিপরীতে অপর দল জাতি বা দেশ শক্তিশালী বা ধনী অথবা প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত, এমতাবস্থায় শুধু এসব শক্তিশালী ও ধণাঢ্য দল বা দেশের প্রথম পক্ষের সাথে চুক্তি ভঙ্গ বা বাতিল করে দ্বিতীয় পক্ষের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে এই আয়াতে অন্যায় এবং ধুর্তামি বলা হয়েছে। এটা যদিও দল, দেশ বা জাতির স্বার্থের কথা ভেবে করা হোক না কেন। আল্লাহ্ তাআলা এ ধরনের ঠগবাজী ও ধুর্তমি বা ডিপ্লোমেসীকে অপছন্দ করেন এবং এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, প্রতিটি চুক্তি বা অংগীকার আসলে অংগীকারকারী ব্যক্তি, দল এবং জাতি ও রাষ্ট্রের চরিত্র ও বিশ্বস্ততার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। আর যারা পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে তারা আল্লাহ্র আদালতে জবাবদিহির হাত থেকে কোন ভাবেই বাঁচতে পারবে না। অতঃপর আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ্ তায়ালা শেষ বিচারের দিন সমস্ত রহস্য উন্মোচন করে দেয়ার হুমকি দিয়ে বলেন–

وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ–

আর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তোমাদের মতবিরোধের রহস্য উন্মোচন করে দেবেন।

অর্থাৎ যেসব মতবিরোধের কারণে তোমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছে সেগুলোর ব্যাপারে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী তার ফায়সালা তো হবে। কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই কেউ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এবং তার প্রতিপক্ষ পুরোপুরি পথভ্রষ্ট ও মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তার জন্য কখনো কোন ভাবেই তাকে আলাদা করে অংগীকার ভঙ্গ, মিথ্যাচারিতা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়া যাবে না। যদি কেউ এ পথ অবলম্বন করে তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র পরীক্ষায় সে অকৃতকার্য প্রমাণিত হবে। কারণ সততা, বিশ্বাস পরায়ণতা ও ন্যায়-নিষ্ঠতা কেবলমাত্র চরিত্র, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে বরং বাস্তব প্রয়োগ, পদ্ধতি ও উপায় উপকরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিছু কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠী প্রায়ই এ ধরনের অহমিকা পোষণ করে থাকে যে, যেহেতু তারা আল্লাহ্র পক্ষের লোক এবং তাদের প্রতিপক্ষ আল্লাহ্ বিরোধী। তাই যে কোন ভাবে বা পদ্ধতিতেই হোক না কেন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অধিকার তাদের রয়েছে। তাই তারা মনে করে আল্লাহ্র অবাধ্য লোক বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় সততা ও বিশ্বাস্ততার পথ অবলম্বন করা এবং অংগীকার চুক্তি

www.pathagar.com

পালনের কোন প্রয়োজন পড়ে না, এটা তাদের অধিকার। আরবের ইহুদীরাও ঠিক একথাই বলতো। তারা বলাতো لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِّيِّيْنَ سَبِيْلٌ **অর্থাৎ আরবের মুশরিকদের ব্যাপারে আমাদের হাত পা কোন বিধি-নিষেধের শৃংখলে বাঁধা নেই**। তাদের সাথে সব ধরনের বিশ্বাস ঘাতকতা করা যেতে পারে। যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করে আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্রদের স্বার্থ উদ্ধার এবং কাফেরদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়, তা অবলম্বন করা সম্পূর্ণ বৈধ। এজন্য তাদের কোন জিজ্ঞাসাবাদ ও জবাবদিহির সামনা-সামনি হতে হবে না বলে তারা মনে করতো। অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً–

যদি তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ না হোক এটাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতো তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকে একই উম্মতে পরিণত করে দিতেন।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত বক্তব্যের একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন– যদি কেউ নিজেকে আল্লাহ্‌র দলের লোক মনে করে ভাল-মন্দ এবং সততা-অসততা উভয় পদ্ধতিতেই নিজের ধর্মের প্রসার ও অন্যের ধর্মকে ধ্বংস করার হীন চেষ্টা চালায়, তাহলে তার এ প্রচেষ্টা হবে সরাসরি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বিরোধী। কারণ মানুষের ধর্মীয় মতবিরোধের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে যদি সমস্ত মানুষকে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক একটি ধর্মের অনুসারী বানানোই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য হতো তাহলে এজন্য আল্লাহ্ তাআলা তার নিজের তথাকথিত পক্ষের লোকদেরকে প্রতিপক্ষের উপর লেলিয়ে দেয়ার এবং তাদের অস্ত্রের সাহায্য নেওয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। এ কাজ তো তিনি নিজেই তার ক্ষমতার দ্বারা করতে পারতেন। তিনি সবাইকে মুমিন ও অনুগত বান্দা হিসেবে এক জাতি করে সৃষ্টি করতেন এবং তাদের থেকে কুফরী ও গোনাহ্ করার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতেন। এরপর ঈমান ও আনুগত্যের পথ থেকে একচুল পরিমাণ সরে আসার ক্ষমতা আর কারো থাকতো না।

অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন ঃ

وَلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ **আর তিনি যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে চান সঠিক পথ দেখান।**

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করার পর ভাল-মন্দ

www.pathagar.com

বিচার করার ক্ষমতাও তাদেরকে দান করেছেন। সাথে সাথে মানুষকে ভাল-মন্দ গ্রহণ ও বর্জন করার স্বাধীনতাও দিয়েছেন। তাই দুনিয়াতে মানুষের পথ বিভিন্ন। কেউ গোমরাহী বা খারাপ পথে যেতে চাইলে তার জন্য সমস্ত উপকরণও তৈরী করে দিয়েছেন। সুতরাং যদি কেউ গোমরাহীর পথে যেতে চায় আল্লাহ্ তাকে বাধা দেন না বরং তার জন্য সুযোগ করে দেন। আবার যদি কেউ সঠিক পথ পেতে চায়, তারও আল্লাহ্ ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আল্লাহ্ তাকে সঠিক পথ অবলম্বন করার সুযোগ করে দেন। এ জন্যই আল্লাহ্ পাক একথা বলেছেন যে, যাকে চান অর্থাৎ যে চায়, আল্লাহ্ তাকে পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী করে দেন এবং যাকে চান অর্থাৎ যে চায়, আল্লাহ্ তাকে হেদায়াত বা সুপথগামী করেন। এক্ষেত্রে অনেকে আল্লাহ্কে দায়ী করে থাকে এটা তাদের অজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ এই জন্য দায়ী নন। কেননা, আল্লাহ্ মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন, আবার স্বাধীনতাও দিয়েছেন। অতএব দুনিয়ার এই স্বাধীন, জ্ঞান পাপী, অকৃতজ্ঞ মানুষেরাই দায়ী।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক আয়াতের শেষাংশে বলেন ঃ

وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ **আর অবশ্যই তোমরা তোমাদের সমস্ত কার্য-কলাপ সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে।**

অর্থাৎ মানুষ যে যাই করুক না কেন, সকলকেই কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্র দরবারে হাজির হয়ে সব বিষয়ে এবং প্রতিটি কথা ও কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবে। কেহই জবাবদিহিতার হাত থেকে রেহায় পাবে না।

পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক আরও একটি নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا-

(হে মুসলমানেরা!) তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে ধোকা দেবার বাহানা বা মাধ্যম বানিয়ে নিও না। তা হলে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে।

এই আয়াতে আরও একটি বড় ধরনের শাস্তি ও অপরাধ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অপরাধটি হলো এই যে, যখন কেউ কসম বা চুক্তি করে এবং কসমের সময় তা ভঙ্গ করার ইচ্ছা রাখে এবং প্রতিপক্ষকে ধোকা দেবার

জন্য কসম খায়, তাহলে এটা সাধারণ কসম ভঙ্গ করার চাইতেও বেশী বিপদজনক এবং অপরাধমূলক। এদেরকে প্রতারক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর পরিণতি এতো ভয়াবহ যে ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا **অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে** বাক্যের উদ্দেশ্যই তাই।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ আয়াতের শেষাংশে বলেন ঃ

وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ-

আর তোমরা খারাপ পরিণতি দেখতে পাবে এই কারণে যে, তোমরা আমার পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছ এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে।

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি একবার ইসলামের সত্যতা মেনে নিয়ে ইসলামে প্রবেশের পর তোমাদের অসৎ আচরণের কারণে আল্লাহ্র দ্বীন থেকে সরে যায় এবং মুমিনদের দলভুক্ত হতে শুধুমাত্র এই কারণে দূরে থাকে যে, যাদের সাথে তার উঠা-বসা হয়েছে তাদের আচার-আচরণ ও লেন-দেন কাফেরদের চেয়ে ভালো কিছু দেখতে পায়নি। আর মুমিনদের এই আচার রণের বৈপরিত্ত থাকার কারণে তাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

আর তোমরা আল্লাহ্র অঙ্গীকারকে সামান্য লাভের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে যা আছে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা তা জান।

এখানে অঙ্গীকার বলতে আল্লাহ্ বলেন, তোমরা যে অঙ্গীকার আমার সাথে বা আমার দ্বীনের প্রতিনিধি হিসেবে করেছো।

আয়াতে "সামান্য লাভের বিনিময়ে" অর্থ এই নয় যে, বেশী লাভ বা বড় স্বার্থের বিনিময়ে তা বিক্রি করা যাবে। আর "সামান্য লাভ বা মূল্য" বলে দুনিয়ার লাভ বা মুনাফাকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং দুনিয়ার যে কোন লাভ বা স্বার্থ আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকারের তুলনায় সামান্যই মূল্য। আল্লাহ্র সাথে

www.pathagar.com

অঙ্গীকার রক্ষা করলে পরকালে যে মহা এবং চিরস্থায়ী মূল্য পাওয়া যাবে তা দুনিয়ার এই সামান্য এবং ক্ষণস্থায়ী মূল্য ও স্বার্থের তুলনায় অনেক অনেকগুণ বেশী। অতএব যে ব্যক্তি বা যারা আল্লাহ্‌র সাথে দুনিয়ার এই সামান্য এবং ক্ষণস্থায়ী মূল্যের বিনিময়ে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তারা বড় লোকসানের কারবার করে। সুতরাং কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনন্তকালের স্থায়ী এবং উৎকৃষ্ট নিয়ামত ও ধন-সম্পদকে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার এই অস্থায়ী ও সামান্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করতে পারে না। এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অতঃপর মহান আল্লাহ্‌ পরবর্তী আয়াতে বলেন ঃ

مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ط

তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, তা সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তাই চিরদিন থাকবে। আয়াতে "যা কিছু তোমাদের কাছে আছে" বলে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী মুনাফাকে বুঝানো হয়েছে। আর এসব মুনাফা বা লাভ স্থায়ী নয়, ধ্বংসশীল। পক্ষান্তরে 'আল্লাহ্‌র কাছে যা বাকী আছে" এই বলে পরকালের স্থায়ী নিয়ামত এবং আযাব উভয়ই বুঝানো হয়েছে। পরকালের নিয়ামত চিরস্থায়ী এবং আযাবও অনন্তকালের। তাই যারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী লাভ বা স্বার্থের জন্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তাদেরকে পরকালে অনন্তকালের আযাব ভোগ করতে হবে। আবার যারা দুনিয়ার এই সামান্য এবং ক্ষণস্থায়ী লাভ ও স্বার্থকে উপেক্ষা করে আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার বা চুক্তিকে রক্ষা করবে তাদেরকে পরকালে চিরস্থায়ী নিয়ামতে ভরা জান্নাত দান করা হবে।

مَا عِنْدَ كُمْ **তোমাদের কাছে যা আছে** বাক্যটির অর্থ ব্যাপক অর্থ বোধক। এর দ্বারা মানুষের স্বাভাবিক খেয়ালী শুধু ধন-সম্পদই নয়। বরং এতে দুনিয়ার আনন্দ-নিরানন্দ, সুখ-দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা, আরাম-কষ্ট, লাভ-লোকসান, বন্ধুত্ব-শত্রুতা ইত্যাদি রয়েছে। এগুলো সবই ক্ষণস্থায়ী এবং ধ্বংসশীল।

আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ-

আমি অবশ্যই ধৈর্য ধারনকারীদের তাদের উত্তম-কাজের বিনিময়ে আনুপাতিক হারে প্রতিফল দান করবো।

www.pathagar.com

অত্র আয়াতে ধৈর্যের সাথে অঙ্গীকার রক্ষা এবং সৎ আমলকারীদের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সবর অবলম্বনকারী এমন সব লোক যারা দুনিয়ার সকল প্রকার লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা ও স্বার্থের মোকাবেলায় সত্য ও সততার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার রক্ষা করতে এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে গেলে যেসব বাধা ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, তা তারা সবই বরদাশত করে নেয়। দুনিয়ার লাভ ও স্বার্থকে তারা দূরে নিক্ষেপ করে। পরকালের সফলতা লাভের জন্য দুনিয়ার জীবনের স্বার্থকে উপেক্ষা করে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে থাকে। আর তাদের এই ধৈর্য, সততা ও নেক আমলের জন্যই তাদেরকে আনুপাতিক হারে আখেরাতে প্রতিদান দেয়া হবে।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ সৎকর্মী পুরুষ-নারী সকলের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের মর্যাদা ও প্রতিদানের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ–

যে ব্যক্তিই নেক আমল করবে – সে পুরুষ হোক কিম্বা নারী-যদি সে মুমিন হয়, তবে তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন-যাপন করাব। আর (পরকালে) এ ধরনের ব্যক্তিদের তাদের আমল অনুপাতে প্রতিফল দান করবো।

দারসের জন্য তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর সর্বশেষ এই আয়াতে মুমিন সৎ কর্মশীল পুরুষ এবং নারী-উভয়ের সৎ কাজের উত্তম প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে। এসব মুমিন–মুমিনা পুরুষ এবং নারীকে তাদের সৎ কাজের আনুপাতিক হারে দু'টি প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো দুনিয়ায় এবং অপরটি হলো আখেরাতে।

(i) **দুনিয়ার জীবনে প্রতিদান ঃ** حيوة طيبة **অর্থাৎ পবিত্র জীবন যাপন।"** অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে "হায়াতে তাইয়্যেবা বলে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন যাপনকে বোঝানো হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ 'পারলৌকিক জীবন' বলেছেন।

এই আয়াতে মুমিন ও কাফের উভয় দলের এমনসব সংক্রীর্ণচেতা ও অধৈর্য

www.pathagar.com

লোকদের ভুল ধরে দেয়া হয়েছে, যারা মনে করে, দুনিয়ার জীবনে যারা সৎ, ন্যায় পরায়ন, বিশ্বস্ত ও পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপন করে তারা পারলৌকিক সফলতা লাভ করলেও দুনিয়ার জীবন তাদের বিফল হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়। প্রতি উত্তরে মহান আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের এই ধারণা ভুল। তাদের এই সততা ও ন্যায় পরায়নতা এবং সৎ আমলের জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়াতে দু'টি প্রতিদান দেন। যেমন–

ক) মর্যাদা বা সম্মান, খ) প্রশান্তি। এ দু'টি হলো ধৈর্যশীল মুমিনদের পবিত্র জীবন যাপন। যদিও কোন মুমিন ব্যক্তি কোন সময় পার্থিব অভাব-অনটন কিম্বা কষ্টে পড়ে তবে তাকে দু'টি বিষয় উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। ক) অল্পে তুষ্টি এবং অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের অভ্যাস, যা দরিদ্রতার মাঝেও কেটে যায়। খ) তার এ বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটন ও অসুস্থতার বিনিময়ে পরকালে বড় মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নিয়ামত পাওয়া যাবে। কিন্তু কাফের ও পাপাচারীদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হলে তার জন্য শান্তনার কোন ব্যবস্থা নেই, ফলে সে কান্ড-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মানুসিক অশান্তিতে ছটফট করে। কান্ড-জ্ঞান হারিয়ে এক পর্যায়ে সে আত্মহত্যাও করে বসে। আর যদি সে সচ্ছল জীবনের অধিকারী হয়, তবে আরো বেশী পাবার লোভে তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। সে কোটিপতি হয়ে গেলেও সে ধনকুপ হওয়ার চিন্তায় জীবনকে বিড়ম্বনাময় করে তোলে।

(ii) আখেরাতের জীবনে প্রতিদান ঃ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

আর (পরকালে) তাদের (দুনিয়ার) আমল অনুপাতে প্রতিফল দান করবো।

সৎ আমলকারী মুমিন-মুমিনাদের আখেরাতের যে প্রতিদান তা এখানে বলা হয়েছে। দুনিয়ার জীবনে মানুষ ভাল আমলই হোক আর খারাপ আমলই হোক একই রকম করে থাকে না, কম বেশী হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তো ন্যায় বিচারক। সুতরাং মানুষের আমলের ভিন্নতার জন্য আখেরাতেও তিনি শাস্তির জন্য জাহান্নামের স্তর বা শ্রেণী বিন্যাস করে রেখেছেন। আবার পুরস্কার বা প্রতিদানের জন্যও জান্নাতের স্তর বা শ্রেণী বিন্যাস করে রেখেছেন। তাই আয়াতাংশে বলা হয়েছে সৎ আমলকারী, বিশ্বস্ত ও ন্যায় পরায়ন পুরুষ-নারীর আখেরাতের যে প্রতিদান বা পুরস্কার তা তার দুনিয়ার জীবনের সৎ আমলের অনুপাতেই দান করবেন। যে যেই স্তর বা শ্রেণী উপযোগী আ'মল করবে

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তাকে সেই শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত মর্যাদা এবং জান্নাত দান করবেন। নেককারদের জন্য পারলৌকিক জীবনের সর্বউত্তম মর্যাদা ও প্রতিদান হলো আল্লাহ্র দিদার বা স্বাক্ষাৎ লাভ। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সেই ধরনের আমল করার তাওফীক দান করুন। আমিন।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে 'সূরা নাহল' থেকে যে দারস পেশ করলাম, সেই দারস থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় রয়েছে তাহলো ঃ

✪ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং বিচার ব্যবস্থায় ও নেতৃত্ব কর্তৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে আদাল বা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যার যা হক বা অধিকার নিরপেক্ষভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

✪ স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি ইহ্সান করতে হবে। স্রষ্টা তথা আল্লাহ্ তাআলার এবাদত বন্দেগী আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পালনের মাধ্যমে ইহসান করতে হবে। আর সৃষ্টি তথা মানুষ সহ অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শনের মাধ্যমে ইহ্সান করতে হবে।

✪ আত্মীয়-স্বজনদের হক বা অধিকার আদায় করতে হবে। বিশেষ করে মৌলিক অধিকার বা চাহিদা যেমন, খাদ্য-খাবার, পোষাক-আসাক, চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রুসা, থাকার ঠাঁই এবং জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। দুরত্ব অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অধিকার আদায় করতে হবে এবং যার যা সম্মান বা মর্যাদা তা দিতে হবে।

✪ সকল সময় ও সকল অবস্থায় অশ্লীল কথা, কাজ, চিন্তা ও আচরণ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করে লজ্জা অবলম্বন করতে হবে।

✪ সকল প্রকার 'মুনকার' বা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় কাজ হতে দূরে থাকতে হবে। কেননা, সকল প্রকার 'মুনকার' কাজই হলো পাপাচার বা গোনাহ্র কাজ।

✪ অহঙ্কার-আত্মম্ভরিতা, যুলুম-নির্যাতন ও বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা আয়াতে এগুলো করতে নিষেধ করেছেন।

✪ সব ধরনের শপথ বা অঙ্গীকার, ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি, বাইয়াত বা চুক্তি এবং আল্লাহ্র নামে কসম অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। তা আল্লাহ্র সাথেই হোক বা আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারী সংগঠনের কাছে হোক অথবা বৈষয়িক

www.pathagar.com

কোন কাজ-কাম বা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য পরস্পর-পরস্পরের মধ্যে হোক, কিম্বা রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বার্থেই হোক না কেন।

✪ নিজের পক্ষ থেকে আগে কোন চুক্তি বা শপথ ভঙ্গ করা যাবে না। তবে প্রতিপক্ষ ভঙ্গ করলে নিজের বা দেশ ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য আত্মরক্ষা করা যাবে।

✪ বেশী লাভ বা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য পরস্পরকে ধোকা দেবার উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ বা অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া যাবে না। কেননা, এটা এক প্রকার বড় ধরনের মিথ্যাচারিতা এবং প্রতারণা।

✪ সকল প্রকার চুক্তি, বাইয়াত বা অঙ্গীকার এবং কসম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক প্রকারের বড় ধরনের পরীক্ষা। তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চান কারা কারা সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি, লোভ-লালসা এবং স্বার্থকে উপেক্ষা করে তাদের কসম, চুক্তি এবং বাইয়াতের উপর টিকে থাকতে পারে।

✪ আল্লাহ্ তাআলা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি বা অঙ্গীকার সম্পর্কে যতো প্রকারের বাহানা বা মতানৈক্য আছে তা কিয়ামতের দিন প্রকাশ করে দেবেন।

✪ দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে যেসব মতানৈক্য রয়েছে তা দূর করার দায়িত্ব মানুষের। সঠিক বিষয় উৎঘাটন করে সঠিক পথে চলার জন্যই তো আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও হেকমত দিয়ে তৈরী করেছেন।

✪ সঠিক পথে কিংবা গোমরাহীর পথে চলা না চলার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলার কোন ভূমিকা নেই। বরং জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ স্বাধীন মানুষেরই প্রকৃত ভূমিকা রয়েছে। তবে আল্লাহ্‌র ভূমিকা রয়েছে এটাই যে, যে যা চায় বা যে যেই পথে চলতে চায় তাকে তিনি বাধা না দিয়ে সহযোগীতা করেন মাত্র।

✪ প্রতিটি মানুষের আত্মউপলব্ধি থাকতে হবে যে, আমরা যে যাই করিনা কেন, অথবা আমাদের ভূমিকা যাই হোক না কেন, কিয়ামতের দিন অবশ্যই আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হবে।

✪ নিজেদের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য কসম করা যাবে না। যদি এটা করা হয় তাহলে এটা হবে তার জন্য মারাত্মক ক্ষতি এবং ধ্বংসের কারণ।

✪ নিজে যেমন আল্লাহ্‌র পথে চলবে তেমনি অন্যকেও আল্লাহ্‌র পথে চলতে সাহায্য করবে। কোন প্রকার বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। কেননা, এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

www.pathagar.com

✪ দুনিয়ার সামান্য লাভে কিংবা ক্ষুদ্র স্বার্থে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা এবং আল্লাহ্‌র নামে করা অঙ্গীকার কোন ভাবেই বিক্রয় বা ভঙ্গ করা যাবে না। কেননা, অঙ্গীকার বা ওয়াদা রক্ষার বিনিময়ে আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে কিংবা যা পাওয়া যাবে তা দুনিয়ার তুলনায় অতি উত্তম এবং অতীব মূল্যবান।

✪ দুনিয়াতে মানুষের যে লাভ-লোকসান তা ক্ষণস্থায়ী এবং ধ্বংসশীল। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে পরকালে যে পুরস্কার এবং আযাব আছে তা চিরস্থায়ী, শেষ হবার নয় এবং কোন দিনই ধ্বংস হবে না।

✪ দুনিয়ার কৃত আমল বা কাজ– তা সৎ কাজই হোক আর অসৎ কাজই হোক কিয়ামতের দিন তাকে আনুপাতিক হারে পুরস্কার এবং আযাব দেয়া হবে। তার প্রতি কোন ভাবেই বেইনসাফী করা হবে না।

✪ সৎ আমলকারী নেক্কার মুমিন পুরুষ-নারী সকলকেই আল্লাহ্‌আআলা উভয় জগতে প্রতিদান দেবেন। দুনিয়াতে পুরস্কার বা প্রতিদান হিসেবে তিনি "হায়াতে তাইয়্যেবা' বা পবিত্র জীবন তথা সম্মান এবং শান্তিময় জীবন দান করবেন। আর আখেরাতে তিনি সর্বউত্তম জান্নাত দান করবেন এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও দিদার বা স্বাক্ষাৎ লাভ করাবেন।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/ বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা নহলের ৯০-৯৭ পর্যন্ত আয়াতগুলোর দারস পেশ করতে যেয়ে যেসব তথ্য, তত্ত্ব, ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করলাম এতে যদি আমার পক্ষ থেকে কোন ভুল-ভ্রান্তি এবং বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে আমরা যেসব গুরুত্বপূর্ণ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণকামী শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমল করে আখেরাতের চিরস্থায়ী কল্যাণ লাভ করতে পারি সেই তাওফিক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। 'মাআস সালাম'।

www.pathagar.com

তিন

অতীতের নবীদের দ্বীনের ন্যায় একই দ্বীনের দাওয়াত দান এবং প্রতিষ্ঠার নির্দেশ

(সূরা শুরা-১৩-১৬)

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ط اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ- وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْ م بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْ ط وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْ م بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ- فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ط اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ط لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ط لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ط اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ

www.pathagar.com

الْمَصِيْرُ- وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ-

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ ইচ্ছে- (১৩) তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের জন্যে দ্বীনের সেই বিধি-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা এখন তোমার কাছে (হে মুহাম্মদ) অহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি এবং যার আদেশ ইতিপূর্বে আমি দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। এ কথা-ই এই মুশরিকদের পক্ষে বড় কঠিন ও দুঃসহ, যার দিকে (হে মুহাম্মাদ) তুমি এই লোকদেরকে দাওয়াত দিচ্ছো। আল্লাহ্ যাকে চান আপন করে নেন এবং যে তাঁর দিকে রুজু বা অভিমুখী হতে চায় তিনি তাকে পথ দেখিয়ে থাকেন। (১৪) মানুষের মধ্যে যে বিরোধ-বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তা তাদের কাছে ইলম বা জ্ঞান এসে পৌঁছার পর হয়েছে। আর তা হয়েছে এই কারণে যে, তারা পরস্পর একে অপরের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিলো। তোমার রব আগে থেকেই যদি একথা বলে না দিতেন যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তা হলে এতদিনে তার ফায়সালা করে দেয়া হতো। প্রকৃত কথা এই যে, আগের লোকদের পরে যাদেরকে কিতাবের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে তারা সেই ব্যাপারে বড় অস্বস্তিকর সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। (১৫) সুতরাং (হে মুহাম্মদ) তুমি এখন এই দ্বীনের দিকেই দাওয়াত দাও। আর তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার উপর অবিচল থাকো, আর এই লোকদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তাদেরকে বলো, আল্লাহ্ যে কিতাবই নাযিল করেছেন, আমি তার উপর ঈমান এনেছি। আমি তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্ আমাদেরও রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই। আল্লাহ্ আমাদের সকলকেই একদিন একত্রিত করবেন এবং তাঁর কাছেই আমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। (১৬) আল্লাহ্র দ্বীন মেনে নেয়ার পর যারা সে সম্পর্কে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে, তাদের বিতর্ক ও দলীল-প্রমাণ

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র কাছে বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য। তাদের উপর (দুনিয়াতে) তাঁর গযব এবং (পরকালে) কঠিন আযাব রয়েছে।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ شَرَعَ -তিনি বিধি-বিধান দিয়েছেন। لَكُمْ-তোমাদের জন্য। مِنَ الدِّيْنِ -দ্বীন বা জীবন বিধান এরই। مَا- যা। وَصّٰى -নির্দেশ দিয়েছিলেন। بِهٖ -সে সম্পর্কে। وَ -এবং। اَوْحَيْنَا -আমি ওহী বা প্রত্যাদেশ করেছি। اِلَيْكَ -তোমার কাছেও। وَمَا -এবং যা। وَصَّيْنَا -এবং আমি নির্দেশ করেছি। اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ- তোমরা দ্বীন কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করো। لَا تَتَفَرَّقُوْا -তোমরা অনৈক্য বা মতোবিরোধ করো না। فِيْهِ-তার মধ্যে। كَبُرَ -বড় কঠিন বা দুঃসহ হয়েছে। عَلَى- উপর। مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ-তাদেরকে তুমি যার দিকে ডাকো। يَجْتَبِىْ -আপন করে নেন বা মনোনীত করেন। مَنْ يَّشَاءُ -যাকে ইচ্ছা করেন। ويهدى -এবং হেদায়াত দেন বা পথ দেখান। مَنْ يُّنِيْبُ-যে রুজু বা অভিমুখী হয়। مَا تَفَرَّقُوْا -তোমরা মতানৈক্য করো নাই। اِلَّا -এ ব্যাতীত বা ছাড়া। مِنْۢ بَعْدِ- -পরে। مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ-যা তাদের কাছে এসেছে জ্ঞান। بَغْيًا-বাড়াবাড়ি। بَيْنَهُمْ-তাদের মাঝে। لَوْلَا -যদি না। كَلِمَةٌ سَبَقَتْ -পূর্ব কথা বা সিদ্ধান্ত। مِنْ رَّبِّكَ -তোমার রবের পক্ষ থেকে। اِلٰى -দিকে এখনো পর্যন্ত। اَجَلٍ -সময়। مُّسَمًّى -নির্দিষ্ট। لَقُضِىَ -অবশ্যই ফায়সালা হয়ে যেত। بَيْنَهُمْ-তাদের মধ্যে। اِنَّ الَّذِيْنَ -নিশ্চয় যারা। اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ

–কেতাবের ওয়ারেশ বা উত্তরাধিকারী করা হয়েছিলো।بَعْدِ هِمْ –তাদের পরে। لَفِىْ –অবশ্যই মধ্যে আছে। شَكٍّ–সন্দেহ। مِنْهُ–তা থেকে। - مُرِيْبٍ –অস্বস্তিকর, বিভ্রান্তকর। فَلِذٰلِكَ –অতএব, এ জন্যে। فَادْعُ –দাওয়াত দাও বা ডাকো। وَاسْتَقِمْ –এবং অবিচল থাকো। كَمَآ –যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো। اُمِرْتَ–তোমাকে আদেশ করা হয়েছে। لَا تَتَّبِعْ –অনুসরণ করো না। - اَهْوَآءَهُمْ–তাদের খেয়াল-খুশীর। اٰمَنْتُ –আমি ঈমান এনেছি। اُمِرْتُ –আমি আদিষ্ট হয়েছি।لِاَعْدِلَ –আমি যেন ন্যায় বিচার করি। بَيْنَكُمْ- –তোমাদের মধ্যে। رَبُّنَا –আমাদের প্রতিপালক। رَبُّكُمْ –তোমাদের প্রতিপালক। لَنَآ–আমাদের জন্য। اَعْمَالُنَا–আমাদের কর্মসমূহ। لَكُمْ–তোমাদের জন্যে।اَعْمَالُكُمْ –তোমাদের কাজ সমূহ। لَا حُجَّةَ –কোন ঝগড়া নেই। بَيْنَنَا –আমাদের মাঝে। يَجْمَعُ–একত্রিত করবেন। اِلَيْهِ–তারই দিকে। الْمَصِيْرُ- প্রত্যাবর্তন। يُحَآجُّوْنَ- তারা বিতর্ক করে। بَعْدِ –পরে। اُسْتُجِيْبَ–সাড়া দেয়া হয়েছে। حُجَّتُهُمْ –তাদের যুক্তি বা দলিল। دَاحِضَةٌ –বাতিল। عِنْدَ-–কাছে। رَبِّهِمْ –তাদের প্রতিপালকের। عَلَيْهِمْ –তাদের উপর। غَضَبٌ –গযব অভিসম্পাত। عَذَابٌ –শাস্তি। شَدِيْدٌ –শক্ত, কঠিন।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে/প্রোগ্রামে উপস্থিত দ্বিনী/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে আল-কুরআনের দারস পেশ করার জন্যে সূরা শু'রার ১৩-১৬ পর্যন্ত চারটি আয়াত তিলাওয়াত ও তরজমা পেশ

www.pathagar.com

করেছি। আল্লাহপাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিক ভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। 'ওমা তাওফীকি ইল্লাহ্ বিল্লাহ্'।

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে অত্র সূরার ৩৮ নং আয়াতে উল্লেখিত وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ অর্থাৎ "তাদের যাবতীয় বিষয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়"। شُوْرٰى অর্থ 'পরামর্শ'।

অন্যান্য সূরার মতো এই সূরাটিরও নামকরণ 'প্রীতকী' বা 'চিহ্ন' হিসেবে করা হয়েছে, 'শিরোনাম' হিসেবে নয়। তবে যা করা হয়েছে, তা ওহীর মাধ্যমে করা হয়েছে। সূরাটির মোট আয়াত সংখ্যা ৫৩।

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। যাকে মাক্কী সূরা বলা হয়। তবে মক্কায় কোন্ সময় অবতীর্ণ হয়েছে এ ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে সূরাটির বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট মনে হয় যে, এই সূরাটির পূর্ববর্তী সূরা 'হা-মীম-আস-সিজদাহ্র' পর পরই নাযিল হয়ে থাকতে পারে। কেননা, এই সূরাটি পূর্ববর্তী সূরার এক প্রকারের "উপসংহার" বা 'পরিশিষ্ট' বলে মনে হয়। পূর্ববর্তী সূরা 'হা-মীম আস সিজদাহ্' যে কেউ গভীর ভাবে পড়বে এবং চিন্তা-গবেষণা করবে এবং অতঃপর এই সূরাটি পড়বে সে-ই এ ব্যাপারটি বুঝতে পারবে। আর সূরা 'হা-মীম আস সিজদাহ অবতীর্ণ হয় হযরত হামযা (রাঃ) এর ইমান আনার পর এবং হযরত ওমর (রাঃ) এর ঈমান আনার পূর্বে। অতএব ধরে নেওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুয়তের ৪র্থ/৫ম বছর অর্থাৎ মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে সূরাটি নাযিল হয়ে থাকতে পারে। তবে এ ব্যাপারে আল্লাহ পাকই বেশী জানেন।

সূরাটির সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু ঃ সুরাটিতে মক্কার মুশরিকদেরকে দ্বীনের যে দাওয়াত তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার জন্য মহানবী (সাঃ) দাওয়াত দিচ্ছেন তা বিনা যুক্তি এবং প্রতিবাদে মেনে নেওয়ার আহবান জানানো হয়েছে।

দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াতের বিষয়বস্তু ঃ সকল নবীকে একই দ্বীন কায়েম বা প্রতিষ্ঠর জন্য নির্দেশ দান এবং দ্বীনের ব্যাপারে মতানৈক্য বা মতপার্থক্য করে ছিন্ন-ভিন্ন না হয়ে যাওয়ার আহবান। দ্বীনের দাওয়াত অন্যদেরকে দেওয়া এবং নিজেও তার উপর মজবুতির সাথে দাঁড়িয়ে থাকা এবং একবার দ্বীন কবুল করে নেওয়ার পর সে ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে না

www.pathagar.com

পড়া। আর যারা একাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে গযব এবং আখেরাতে রয়েছে কঠিন আযাব।

ব্যাখ্যা ঃ উপস্থিত প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে দারসের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তথ্য প্রদান করা হলো। এখন আমি তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যা পেশ করছি।

সূরার ১৩ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই বিধি-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর এখন যা (হে মুহাম্মাদ) আমি তোমার প্রতি ওহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং এতে মতানৈক্য করে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেও না।

সূরার প্রথম আয়াতে যে কথাটি বলা হয়েছে, এখানে সেই কথাটিই আরো স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, হে কাফের মুশরিক দলের লোকেরা মুহাম্মদ (সাঃ) যে দ্বীন নিয়ে আগমন করেছেন এটা তাঁর নিজস্ব বানোয়াট কোন নতুন দ্বীন নয়। আর ইতিপূর্বে যেসব নবী-রাসুলগণ দ্বীন নিয়ে আগমন করেছিলেন তাও তাদের নিজস্ব কোন রচিত দ্বীন ছিলো না। বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পাওয়া একই দ্বীন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলগণই তাদের আপন আপন জাতির কাছে পেশ করেছেন।

আয়াতে পাঁচজন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম নূহ (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের পর পরবর্তী মানব জাতির জন্য তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম নবী। তার পরই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর তিনি হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ আরবের লোকেরা তাঁকে নিজেদের পথ প্রদর্শক নেতা হিসেবে মনে করতো। অতঃপর হযরত মুসা

www.pathagar.com

ও ঈসা (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, ইয়াহুদী ও ঈসায়ীরা (খৃষ্টানেরা) নিজেদের ধর্ম তাদের নিকট হতে পেয়েছে বলে দাবী করতো। তবে এই পাঁচজন নবীর নাম উল্লেখ হয়েছে বলে এই নয় যে, এই পাঁচজন নবীকেই বুঝি আল্লাহ্‌র দ্বীনের হেদায়াত দেওয়া হয়েছিলো-আর কাকেও নয়। আসলে কিন্তু তা নয়, বরং এর মূল উদ্দেশ্য হলো একথা জানিয়ে দেয়া যে, এঁরা এবং এঁদের মতো যতো নবী-রাসূলই দুনিয়ায় আগমন করেছেন, তাঁরা সকলেই একই দ্বীন নিয়েই এসেছেন। শুধু দৃষ্টান্ত হিসেবে এই পাঁচজন বিশিষ্ট নবীর নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আহযাবেও আগ-পিছ করে উক্ত পাঁচজন নবীর নাম অঙ্গীকারের প্রশ্নে উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে–

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ –

আর যখন আমি নবীদের কাছ থেকে, তোমাদের কাছ থেকে এবং নূহ ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম। (সূরা আহযাব-৭)

তবে এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে, হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম নবী। তাঁর নাম উল্লেখের মাধ্যমে নবীদের আলোচনা শুরু হলো না কেন ? উত্তর হলো এই যে, দুনিয়াতে আগমনকারী সর্বপ্রথম নবী ছিলেন আদম (আঃ)। দ্বীনের বিষয়ে তিনিও ছিলেন একমত। কিন্তু তাঁর আমলে মানুষের মধ্যে কুফর ও শিরক ছিলো না। কুফর ও শিরকের সাথে দ্বন্দ্ব হযরত নূহ (আঃ)-এর আমল থেকেই শুরু হয়েছে। কাজেই এ ধরনের গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আঃ)। তাই, তাঁর নামের মাধ্যমেই নবীদের আলোচনা শুরু করা হয়েছে। তার পরেও আল্লাহ্ পাকই ভালো জানেন।

এই আয়াতটি দ্বীন-ইসলাম এবং উহার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য খুব গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য এ সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা এবং ব্যাপক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝে নেয়া প্রয়োজন।

আলোচ্য আয়াতটির একেবারে শুরুর কথাটি হলো ঃ شَرَعَ لَكُم অর্থাৎ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। شَرَعَ শব্দের আভিধানিক অর্থ

www.pathagar.com

হলো- 'পথ বেঁধে দেয়া'; আর পারিভার্ষিক অর্থ হলো 'নিয়ম-বিধান''', পদ্ধতি ও 'প্রণালী' নির্দিষ্ট করে দেয়া। আরবী ভাষায় تَشْرِعْ শব্দটি আইন প্রণয়ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর شَرَعَ বা شَرِيْعَتْ অর্থ 'আইন'। আইনদাতা বা আইন প্রনেতাকে বলা হয় شَارِعْ

যেহেতু আল্লাহ্ তাআলাই বিশ্ব জাহানের সবকিছুরই একচ্ছত্র মালিক। আর মানুষের প্রকৃত অলী বা অভিভাবকও তিনি। সুতরাং মানুষের মধ্যে যে সব বিষয়ে মতবিরোধ হবে, তার চূড়ান্ত ফায়সালাকারী তিনিই হতে পারেন। যেহেতু নীতিগত ভাবে আল্লাহ্ই মানুষের মালিক-মনীব, অভিভাবক ও আইনদাতা। অতএব এই অনিবার্য অধিকারের কারণে তিনিই মানুষের জন্য আইন ও নিয়ম-বিধান তৈরী করবেন এবং এই আইন-কানুন ও বিধি-বিধান মানুষকে দান করা তাঁরই দায়িত্ব। আর তাই তিনি তাঁর এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য ঃ আল্লাহ যেহেতু মানুষের সৃষ্টিকর্তা, সুতরাং তিনিই বেশী ভালো জানেন মানুষের লাভ-ক্ষতি। আল্লাহ্র কোন পক্ষ নেই। অতএব তার কোন স্বার্থও নেই। সুতরাং তাঁর রচিত আইনটিও হবে নিরপেক্ষ এবং ইনসাফ ভিত্তিক। অপরপক্ষে মানুষ যেহেতু সৃষ্ট। তাদেরই জন্য আইন-কানুন ও নিয়ম পদ্ধতি। সুতরাং মানব রচিত কোন আইন বা নিয়ম-নীতি নিরপক্ষ হতে পারে না। কেননা, মানুষ নিরপেক্ষ নয়। আইনের সাথে তার স্বার্থ জড়িত থাকে। সুতরাং মানুষের জন্য মানব রচিত কোন আইন বা নিয়ম-নীতি ইনসাফ ভিত্তিক ও কল্যাণকর হতে পারে না। আর এই কারণেই মানুষের মধ্যে হানাহানি এবং অশান্তি সৃষ্টি হয়।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা না হওয়ার পেছনে মূল কারণই হলো গোটা বিশ্ব চলছে এখন মানব রচিত স্বার্থপর আইন দ্বারা। আর এই কারণে মানুষের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হতে পারছে না। মানুষ নিরপেক্ষভাবে ন্যায় বিচার পাচ্ছে না। এই জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকেও মানুষের প্রতি রহমত নাযিল হচ্ছেনা। যদি আজ পৃথিবী আল্লাহ্র রচিত নিরপেক্ষ আইন দ্বারা পরিচালিত হতো, তাহলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত ও দয়া পাওয়া যেত। সূরা আ'রাফে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَلَوْاَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

যখন কোন দেশের জনগণ ঈমান এবং তাক্ওয়ার ভিত্তিতে (আল্লাহ্র আইন দ্বারা) সমাজ পরিচালনা করে, তখন আল্লাহ্ পাক সেই সমাজের জন্য আসমান এবং যমীনের সমস্ত রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেন। (আ'রাফ–৯৬)

এরপর আয়াতে বলা হয়েছে– مِنَ الدِّيْنِ **-দ্বীন বিষয়ে।**

دِيْنٌ শব্দের অর্থ ঃ আরবী ভাষায় 'দ্বীন' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– **প্রথম অর্থ**-প্রভূত্ব ও প্রাধান্য, শক্তি ও আধিপত্য। **দ্বিতীয় অর্থ**–আনুগত্য ও দাসত্ব। **তৃতীয় অর্থ**-প্রতিফল ও কর্মফল এবং **চতুর্থ অর্থ**–পথ, পন্থা, ব্যবস্থা, আইন।

উল্লেখিত আয়াতে দ্বীন (دِيْنٌ) শব্দটি শেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ 'দ্বীন' শব্দের অর্থ জীবন যাপনের পথ বা পন্থা, কিংবা কাজের পদ্ধতি। এমন পন্থা বা পদ্ধতি যা মানুষের জীবনে অনুসরণ করা যেতে পারে।

কিন্তু মনে রাখার বিষয় হলো এই যে, কুরআনের এই আয়াতে কেবল دِيْنٌ-(দ্বীন)-ই বলা হয়নি। বরং কুরআনে বলা হয়েছে اَلدِّيْنُ (আ-দ্বীন)। ইংরেজী ভাষায় This is a way (এই একটি পথ)-এর পরিবর্তে This the way (এই একটিমাত্র পথ) বলায় অর্থের দিক দিয়ে যতখানি পার্থক্য হয় دِيْنٌ- (দ্বীন) এবং اَلدِّيْنُ (আ-দ্বীন) শব্দের মধ্যেও অর্থের দিক দিয়ে ততখানি পার্থক্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ কুরআন এই কথা বলছেনা যে, "ইসলাম আল্লাহ্র নিকট একটি (মনোনীত) ধর্ম"। বরং এর দাবী হলো– "আল্লাহ্র নিকট ইসলাম-ই একমাত্র বিশুদ্ধ ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা বা চিন্তা ও কাজের প্রণালী।" মহান আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেন,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ **একমাত্র ইসলামই হলো আল্লাহ্র নিকট মনোনীত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা।**

www.pathagar.com

সুতরাং দ্বীন প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে কোন ধর্ম নয়। বরং জীবন ব্যবস্থা। শুধু জীবন ব্যবস্থাই নয়, একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। দ্বীনের প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থ 'ধর্ম' কতিপয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু 'জীবন ব্যবস্থায়' কোন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। জীবন ব্যবস্থা বলতে জীবনের বিশেষ কোন দিক বা বিশেষ কোন বিভাগের ব্যবস্থা বুঝায় না। এর অর্থ গোটা জীবনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে জীবন পরিচালনার ব্যবস্থা। অর্থাৎ সকল কালের এবং সকল মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র সমাজের কথাই এখানে বলা হয়েছে। পাশ্চাত্য বাদিদের দেওয়া কোন সংকীর্ণ অর্থ ও বিশেষ এলাকা এবং দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের দেশের মুসলিম নামধারী ধর্ম নিরপেক্ষবাদীরা দ্বীনকে তথা ইসলামকে ধর্মীয় গোন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে পৃথক করে ফেলেছে। আর তাদেরই পেছনে মুসলিম নামধারী লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই জন্য আমাদেরকে কুরআন এবং হাদীস নিজের ভাষায় ভাল ভাবে বুঝে পড়তে হবে। তা না হলে চিরদিন গোমরাহীর মধ্যে থেকেই ঘুরপাক খেতে হবে। আয়াতের পরবর্তী বাক্যগুলো থেকে কয়েকটি কথা আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন ঃ

প্রথম কথা হলো– সকল নবীর দ্বীন একই ঃ আয়াতে দ্বীনের এই বিধান শুধু নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কেই দেয়া হয়নি বরং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ইতিপূর্বে একই দ্বীনের হেদায়াত দেওয়া হয়েছিলো নুহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ)কে। আর এর দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর এই বিধান সরাসরি প্রত্যেক মানুষের উপর পাঠান না। বরং সময় সময় যখনই তিনি প্রয়োজন মনে করেছেন তখনই তিনি সেই জাতির মধ্য থেকেই একজন ব্যক্তিকে নবী-রাসূল নির্দিষ্টও নিয়োগ করে তিনি তাঁরই উপর এই বিধান অর্পণ করে মানুষকে সেই পথে পরচালিত করেছেন।

দ্বিতীয় কথা হলো– প্রতিটি নবীর জন্য পৃথক পৃথক দ্বীন নয় ঃ আয়াতে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি দ্বীনের এই বিধান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই জিনিস এবং একই রকম পাঠিয়েছেন। এক এক সময় এক এক জাতির জন্য এক এক ধরনের দ্বীন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী দ্বীন পাঠান নাই।

www.pathagar.com

তৃতীয় কথা হলো ঃ আল্লাহ্‌র প্রাধান্য ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেবার সংগে সংগে যাদের মাধ্যমে এই বিধান পাঠানো হয়েছে, তাঁদের রেসালাত মেনে নেয়া এবং যে ওহীর সাহায্যে এটা নাযিল হয়েছে তা বিশ্বাস করা এবং মেনে নেয়া দ্বীনেরই একটি অংশ। কেননা, এই বিধান মেনে চলতে হলে এটা যে আল্লাহ্‌র তরফ হতে নাযিল হয়েছে তার অকাট্যতা মেনে নেওয়া এবং সেই বিষয়ে মনের মধ্যে নিশ্চিন্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

অতঃপর সকল নবীদের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ তায়ালা আয়াতের পরবর্তী অংশে বলেন ঃ اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ তোমরা **দ্বীন (জীবন বিধান) প্রতিষ্ঠা করো এবং উহাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।** বাক্যের এই প্রথমাংশের অর্থ– শাহ্ ওলী উল্লাহ্ দেহলবী (রহঃ) করেছেন 'দ্বীনকে কায়েম করো'। আর শাহ রফীউদ্দীন এবং শাহ্ আব্দুল কাদের (রঃ) করেছেন 'দ্বীনকে কায়েম রাখো'। এই দু'টি তরজমাই ঠিক। কেননা - শব্দের অর্থ 'কায়েম করাও' হতে পারে, আবার 'কায়েম রাখাও' হতে পারে। নবী-রাসূলগণ এই দুই ধরনের কাজের জন্যই আদিষ্ঠ ও নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের প্রথম কাজ ছিলো, যেখানে দ্বীন কায়েম নেই সেখানে তা কায়েম করা। আর দ্বিতীয় কাজ ছিলো, যেখানে পূর্ব থেকেই দ্বীন কায়েম আছে সেখানে তা কায়েম রাখা। প্রকৃত পক্ষে কায়েম রাখার প্রশ্ন হয় তখনই, যখন একটা জিনিস যথারীতি কায়েম হয়ে আছে। না হলে প্রথমে উহাকে কায়েম করতে হবে, অতঃপর তা কায়েম রাখার জন্য ক্রমাগত ভাবে চেষ্টা-যত্ন চালিয়ে যেতে হবে।

দ্বীন কায়েম বা প্রতিষ্ঠা বলতে কি বুঝায় তা আমাদের অনুধাবন করা প্রয়োজন। কায়েম করার অর্থ যখন কোন বস্তু বা দেহ সম্পন্ন সম্পর্কে বলা হবে, তখন উহার অর্থ হবে যা বসে আছে তাকে উঠানো বা দাঁড় করানো। যেমন কোন মানুষ বা জীব-জন্তুকে উঠোনো। কিংবা কোন পড়ে থাকা জিনিসকে দাঁড় করানো, যেমন বাঁশ বা খুঁটিকে দাঁড় করা। অথবা কোন পড়ে থাকা বিক্ষিপ্ত জিনিসকে একত্রিত করে উপরে তুলে ধরা। যেমন খালি জমিতে ইমারত নির্মাণ। কিন্তু যেসব জিনিস বস্তুগত বা দেহ বিশিষ্ট নহে, তাত্ত্বিক বা আত্মিক ভাবধারার জিনিস, উহার জন্য 'কায়েম করো' শব্দটি ব্যবহৃত হলে এর অর্থ শুধু 'প্রচার করা' হবে না, বরং সেই অনুযায়ী পুরোপুরি আমল করা, তাকে চালু করা, এবং তাকে কার্যত জারী ও বাস্তবায়িত করাই হবে উহার সঠিক অর্থ। যেমন আমরা বলি দেশে আদালত কায়েম আছে। তখন এর অর্থ এটাই হয় যে,

www.pathagar.com

দেশে ইনসাফ কায়েমের জন্য বিচারক প্রকৃত ঘটনা জানার পর সঠিক ফায়সালা দিচ্ছে।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! বর্তমানে আমাদের দেশে দ্বীন তথা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম বা প্রতিষ্ঠা নেই। সুতরাং এখন দ্বীন প্রতিষ্ঠা করাই হবে أَقِيمُوا الدِّينَ এর সঠিক অর্থ। যদি কেউ দ্বীনের তাবলীগ বা প্রচার করে কিন্তু প্রতিষ্ঠার কাজ না করে তাহলে, أَقِيمُو الدِّينَ এর অর্থের সঠিক হক আদায় হয় না। অতএব এই অবস্থায় বর্তমানে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং জিহাদ একই সাথে পরিচালিত হবে। দ্বীন কায়েমের জন্য দাওয়াত ও তাবলীগ এবং জিহাদ একে অপরের পরিপূরক।

وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ- **এবং উহাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।** আয়াতে বলা হয়েছে সকল নবীর দ্বীন একই ছিলো সুতরাং তোমরা পরস্পরে দ্বীনের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়ে তোমরা নিজেরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না। তোমরা দ্বীন কায়েমের ক্ষেত্রে একমত পোষণ করলেও শরীয়তের যে ভিন্নতা ছিলো তা নিয়ে মতানৈক্য করছো, আর তোমরা সূরা মায়েদার আল্লাহ্‌র এই আয়াত لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جًا তোমাদের **প্রত্যেকের জন্য এক একটা শরীয়াত ও চলার পথ বানিয়ে দিয়েছি।** দলীল হিসেবে নিয়ে এই মতামত দিচ্ছো যে, এই 'দ্বীন' অর্থ শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও নিয়ম-প্রণালী নহে। বরং তাওহীদ, আখেরাত এবং কিতাব ও নবুয়াত মেনে নেয়া এবং ইবাদত করাই এর অর্থ। কিংবা খুব বেশী হলে তা কতকগুলো বড় বড় মৌলনীতি হবে, যা সব শরীয়াতে সমান।

আসলে এটা 'একই দ্বীনের' সঠিক ধারণা নয়। শরীয়ত বিহীন দ্বীনের এই খন্ড ধারণার জন্যই খৃষ্টানেরা বিভ্রান্ত হয়েছে। আর যদি মুসলমানেরাও 'দ্বীন, এবং 'শরীয়তকে' পৃথক করে দেয়, তা হলে তারাও বিভ্রান্ত হবে। তখন তারা মনে করবে, আল্লাহ্ দ্বীন কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন– শরীয়াত কায়েমের কথাতো বলেননি। আসলে দ্বীন কায়েম বলতে শুধু কতিপয় ঈমানী বিষয় নয় এবং কয়েকটি নৈতিক বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং শরীয়াতেরও বিধি-বিধান উহার মধ্যে শামিল রয়েছে। অর্থাৎ সকল যুগে এবং সকল নবীর আমলে একই

www.pathagar.com

দ্বীন এবং শরীয়াত ছিলো, তবে ব্যবহারীক দিক থেকে কিছু পার্থক্য ছিলো। কোরআন এবং হাদীসে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়

প্রকৃত পক্ষে সূরা মায়েদায় উল্লেখিত আয়াতের পূর্বাবার (৪১–৫০) আয়াতগুলোর অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায় যে, উহার অর্থ হবে, যে নবীর উম্মতকে যে শরীয়াতই আল্লাহ্ তায়ালা দিয়েছিলেন, তাই তাদের জন্য দ্বীন ছিলো এবং তাঁর নবুয়তের যুগে তাই কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। আর যেহেতু এখন মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়তের যুগ চলছে, তাই একই কারণে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য আল্লাহ্র দেয়া শরীয়াতই হলো পূর্ণ দ্বীন। মহান আল্লাহ্ বিদায় হজ্জের ভাষণের সময় মহানবী (সাঃ) এর উপর اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ- **আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করলাম**। নাযিল করে এর পূর্ণতা দান করেছেন। সুতরাং এই পরিপূর্ণ দ্বীন তথা আল ইসলাম কায়েম করাই হলো উম্মতে মুহাম্মদীর দায়িত্ব। পূর্বের নবীদের থেকে শরীয়াতের যেসব কিছু পার্থক্য রয়েছে এটা পরস্পর বিরোধী নয়। বরং শরীয়াত সমূহের খুটিনাটি ব্যাপারে অবস্থার দৃষ্টিতে কিছুটা পার্থক্য মাত্র। তাছাড়া وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ "দ্বীনের মধ্যে বিচ্ছেদ **বিচ্ছিন্নতা করিও না।**" বলে এই অর্থও নেওয়া যায় যে, দ্বীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথা বের করা। যেমন– দ্বীন ইসলামে যা নেই তা শামিল করে দেয়া, অথবা দ্বীন ইসলামে যা আছে তা বের করে দেয়া। দ্বীনের বিধি-ব্যবস্থায় কোনরূপ রদ-বদল করা, কিংবা উহাকে বিকৃত করা। দ্বীনের অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজকে কম গুরুত্বপূর্ণ বানিয়ে দেয়া এবং কম গুরুত্বপূর্ণ খুব জোর মোবাহ্ কাজকে ফরজ ওয়াজিব বা তার চেয়েও বেশী ইসলামের রুকন বানিয়ে নেয়া। আর এ ধরনের কাজের জন্যেই অতীতের নবীদের উম্মতেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো। পরে ধীরে ধীরে তাদের এই বিচ্ছিন্নতা ও ভিন্নতা এক পর্যায়ে একএকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্বীন হয়ে গেল।

প্রিয় ভায়েরা/ বোনেরা! বর্তমান যুগেও বিভিন্ন দেশে দেশে বিশেষ করে আমাদের দেশও দ্বীনের খন্ডিত অর্থ করে দ্বীন ও শরীয়াত তথা ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে দ্বীন ইসলামকে কায়েমের ব্যাপারেই খোদ নামধারী মুসলমানেরা বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দ্বীন ও শরীয়াত সম্পর্কে তাদের এই অনৈক্য মানুষকে সঠিক দ্বীন

www.pathagar.com

কায়েমের পথ থেকে দূরে সরে রাখারই এক গভীর ষড়যন্ত্র। তাছাড়া এও দেখা যায় ইসলাম পালনকারী মুসলমানেরাও দ্বীনের মূল জিনিসগুলোকে হালকা করে নিয়েছে এবং অনেক বিষয় এমন আছে যা দ্বীন ইসলামের মধ্যে গণ্য নয়, তা দ্বীন ইসলামের মূল বানিয়ে নিয়েছে। এমনকি অনেক 'বিদআত' জিনিসকেও ইসলামের মূল ইবাদত মনে করে অত্যন্ত ভক্তি ও মহব্বতের সাথে পালন করে যাচ্ছে। এতে আয়াতে উল্লেখিত দ্বীন কায়েমের যে গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে তা এ সমস্ত চিন্তা মনোভাব এবং আমলের কারণে– দ্বীন কায়েমের স্পীরিটকে নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। দ্বীনের মূল স্রোত ধারা থেকে দৃষ্টিকে ভিন্য দিকে প্রবাহীত করা হচ্ছে।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ পাক পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করেনঃ

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ط

(হে মুহাম্মদ সাঃ) তুমি মুশরিকদেরকে যেই কথার দিকে দাওয়াত দিচ্ছো তা তাদের কাছে বড় কঠিন ও দুঃসহ বলে মনে হয়।

যেহেতু আয়াতগুলো মক্কার মুশরিকদের সামনে অবতীর্ণ হয়েছিলো। আর নবী (সাঃ) ও আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে পূর্বের সমস্ত মুশরিকী ধর্মকে ত্যাগ করে তাওহীদ তথা একত্ববাদ এবং পরিপূর্ণ দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের কাছে এই দু'টি দাওয়াত– 'আল্লাহ্কে এক হিসেবে মেনে নেওয়া' এবং 'মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনীত দ্বীন ইসলামকে এর মধ্যে শামিল হওয়া' তাদের জন্য খুবই কঠিন এবং দুঃসহ মনে হচ্ছিল, তারা এটাকে কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছিলো না। তাই আল্লাহ্ তায়ালা আয়াতের শেষাংশে উল্লেখ করেন

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ-

আল্লাহ্ যাকে চান আপন করে নেন এবং তিনি তাকেই হেদায়াত দান করেন যে তার দিকে রুজু হয় বা যেতে চায়।

অত্র সূরার পূর্বের ৮ ও ৯ আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে এখানে তাই আবার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে একথা বলার উদ্দেশ্য হলো এই যে, হে নবী! তুমি তো এই লোকদের সামনে দ্বীনের এই রাজপথ তুলে ধরছো, আর এই নাদান

www.pathagar.com

লোকেরা এই অপূর্ব নেয়ামতের কদোর করার পরিবর্তে তারা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু তাদেরই মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ্‌র দিকে রুজু অর্থাৎ মনোনিবেশ করতে চায়– আর আল্লাহ্‌ও তাদেরকে টেনে টেনে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছেন। নিজের দলভুক্ত করে নিজের লোক হিসেবে মনোনীত করেছেন। এখন কেউ এই নিয়ামত পাচ্ছে আর কেউ না পেয়ে মন খারাপ করছে এটা প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু তাই বলে আল্লাহ্‌র ভান্ডার ছোট নয়। যে লোক তার দিকে রুজু হতে চায়, কেবল তাকেই তিনি নিজের দিকে টেনে নেন। আর যারা তার নিকট থেকে দূরে সরে যেতে চায় বা চেষ্টা করে তাদের পেছন পেছন ধাওয়া করে দলে ভেড়ানো এটা আল্লাহ্‌র রীতি বা নিয়ম নয়। এটা একান্ত তাদেরই নিজস্ব ব্যাপার। কেননা আল্লাহ্‌ মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেক দিয়ে তৈরী করেছেন। আবার তাদের স্বাধীনতাও দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাআলা কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চান না। এটা আল্লাহ্‌ তাআলার সুন্নতের খেলাপ। পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ তাদের বিরোধ বৈষম্যের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ط

মানুষের মধ্যে যে বিরোধ-বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তা তাদের নিকট ইলম বা জ্ঞান এসে পৌঁছার পর হয়েছে। আর তা হয়েছে এই কারণে যে তারা পরস্পরে একে অপরের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিলো।

আয়াতের এই অংশের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,এখানে মক্কার কোরাইশ কাফেরদের অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, সত্যদ্বীন ও সঠিক পথের প্রতি তাদের বিমুখতা আগে থেকেই এমনিতে তো ছিলো, তার পরেও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলম বা জ্ঞান এসে যাওয়ার পরই তারা এরূপ বিতর্ক করেছে। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'জ্ঞান এসে যাওয়ার' অর্থ বলতে তিনি যাবতীয় জ্ঞানের উৎস রাসূলে করীম (সাঃ) এর আগমনকে বুঝিয়েছেন। আবার কেউ কেউ এর অর্থ করেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতরা নিজেদের নবীদের ধর্ম থেকে পৃথক রয়েছে, অথচ তাদের কাছে নবীর মাধ্যমে সঠিক পথের জ্ঞানএসে গিয়েছিলো। মোটকথা এই যে, তারা যে দ্বীনের নিয়ম-নীতির বিষয়ে বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে

www.pathagar.com

পড়েছিলো তাদের কাছে কোন নবী বা কিতাব না আসার কারণে প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়, বরং তারা দ্বীনের ব্যাপারে বিভিন্ন মত পার্থক্য করেছে তাদের কাছে নবী রাসূলের উপর কিতাব নাযিলের মাধ্যমে ইলম বা জ্ঞান আসার পরেই। সুতরাং এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা সেই জন্য দায়ী নন, সেই দায়-দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর পড়ে না। বরং সে জন্য সেই লোকেরা নিজেরাই দায়ী। দ্বীনের সুস্পষ্ট নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান পরিহার করে তারা নিজেরা নিজের মতো করে নিয়ম-নীতি ও ধর্মমত রচনাকরে নিয়েছিলো বলে এর সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাদেরই ভোগ করতে হবে। بَغْيًا بَيْنَهُمْ অর্থাৎ তা হয়েছে এ কারণে যে, তারা একে অপরের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিলো। তারা যে জ্ঞান আসার পরও বিরোধীতা করেছিলো তা কোনো নেক উদ্দেশ্যে নয় বরং তারা যদি সবাই মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনীত দ্বীনের মধ্যে শামিল হয়ে যায়, তা হলে তো তাদের আর কোন নেতৃত্ব কর্তৃত্ব থাকবে না। তাই তারা এই দ্বীনের মধ্যে মত-পার্থক্য সৃষ্টি করে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছিলো। এভাবে তারা ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে যুদ্ধ-কলহ সৃষ্টি করে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়েছিলো।

আয়াতের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ ط

তোমার রব আগে থেকেই যদি একথা বলে না দিতেন যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তা হলে এত দিনে তার ফায়সালা করে দেয়া হতো। অর্থাৎ যেসব লোক নিজেরা গোমরাহ্ ছিলো এবং গোমরাহীর পথ তৈরী করেছিলো এবং জেনে-বুঝে তা অনুসরণ করার অপরাধে তারা অপরাধী ছিলো, তাদের এই অপরাধের কারণে যদি দুনিয়াতেই তাদের সকলকে ধ্বংস করে ফেলা হতো এবং হেদায়াতের সঠিক পথে যারা চলে যদি কেবলমাত্র তাদেরকেই বাঁচিয়ে রাখা হতো। তাহলে এর ফলে কে হক পন্থী আর কে বাতিলপন্থী তা পরিস্কার হয়ে যেত। কিন্তু এই চূড়ান্ত ফায়সালা করার কাজকে আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থগিত করে রেখেছেন। কেননা, দুনিয়ায় যদি এই চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হতো তাহলে মানব জাতির পরীক্ষাই

www.pathagar.com

অর্থহীন হয়ে যেত। এই জন্য মহান আল্লাহ্ তাআলা কাফের,মুশরিক এবং বাতিল পন্থীদের দুনিয়ায় গযব-আযাব দিয়ে সমূলে ধ্বংস না করে কিয়ামত পর্যন্ত পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করেন। আয়াতের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ–

প্রকৃত কথা এই যে,পূর্বের লোকদের পরে যাদেরকে কিতাবের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) বানানো হয়েছে, তারা সেই ব্যাপারে বড়ই অস্বস্তিকর সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।

আয়াতের এই অংশের তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক নবী এবং তাঁর নিকটবর্তী অনুসারীদের সময় অতিবাহিত হবার পর পরবর্তী লোকদের কাছে যখন আল্লাহ্র আসমানি কিতাব নাযিল হলো,তখন তারা তা পূর্ণ আস্থা এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তা গ্রহণ করলো না। বরং তার ব্যাপারে তাদের মনের মধ্যে নানা রকমের ভুল ধারণা, সন্দেহ-সংশয় ও মানসিক জটিলতা সৃষ্টি হলো। ফলে তারা খুব গভীর ও কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়ে গেল। এটা এ কারণে হয়েছিলো যে, আসমানি কিতাব বিশেষ করে তাওরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবের প্রকৃত বক্তব্যকে যেভাবে স্বার্থবাদী ধর্মীয় পন্ডিতেরা নিজেদের সুবিধা মতো কথাকে উক্ত কিতাবের মধ্যে সংযোজন করে দিয়ে বিকৃত করেছিলো। যেমন– সূরা বাকারায় মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

তোমরা সত্য এবং মিথ্যার সংমিশ্রণ করো না এবং তোমরা জেনেশুনে সত্য গোপন করো না।

তাদের বিকৃতির কারণে কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক এটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বিচার-বিবেচনা করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিলো। যার ফলে তারা কিতাবের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হবার পরও তারা তার ব্যাপারে সোবাহ্ সন্দেহ এবং বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়েছিলো।

কাফের মুশরিকেরা নিজেরা পথভ্রষ্ট তো ছিলোই, বরং তারা তৎকালীন নবী

www.pathagar.com

রাসূলদেরকে তাদের পথে চালানোর জন্য চেষ্টায় ছিলো। তাই মহান আল্লাহ্ তাআলা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে মক্কার কাফের মুশরিকদের এসব অপতৎপরতায় বিচলিত না হয়ে বরং তাঁর দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখার তাগাদা দিয়ে পরবর্তী আয়াতে কিছু নির্দেশিকা প্রদান করে বলেন ঃ

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ هُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ-

সুতরাং তুমি এই দীনের দিকেই দাওয়াত দাও। আর তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার উপর অবিচল থাকো, আর এই লোকদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তাদেরকে বলো, আল্লাহ্ যে কিতাবই নাযিল করেছেন, আমি তার উপর ঈমান এনেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্ আমাদের রব এবং তোমাদের রব। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্ম। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই। আল্লাহ্ আমাদের সকলকেই একদিন একত্রিত করবেন এবং তাঁর কাছেই আমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে।

হাফেজ ইবনে কাসীর তার তাফসীরে বলেন, দশটি বাক্য বিশিষ্ট এই আয়াতে পৃথক পৃথক দশটি বিধান বা উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। যা আয়াতুল কুরশী ছাড়া কুরআনের অন্য কোন আয়াতে এর নযীর পাওয়া যায় না। আয়াতুল কুরশীতেও দশটি বিধান বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য এই আয়াতের দশটি বিধান বা উপদেশ নবী করীম (সাঃ) সহ উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য বর্ণিত হলো ঃ

এক. فَلِذٰلِكَ فَادْعُ- অর্থাৎ যদি মুশরিকদের কাছে তোমার তাওহীদের এই দাওয়াত কঠিন মনে হয়, তথাপিও তুমি এ দাওয়াত দেয়া ছেড়ে দেবে না বরং উপর্যপুরি দাওয়াতের এই কাজ চালিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

দুই. وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ 'তুমি এ দ্বীনের প্রতি নিজে অবিচল থাকো,যেমন তোমাকে আদেশ করা হয়েছে।' অর্থাৎ যাবতীয় বিশ্বাস, কর্ম,চরিত্র, অভ্যাস ও সামাজিকতার যথাযথ সমতা ও ভারসাম্য কায়েম রাখো। যেন কোন দিকেই কোনরূপ বাড়াবাড়ি না হয়। তবে এরূপ দৃঢ়তা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এ কারণেই কোন কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে চুলে পাক ধরে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ "সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে"। সূরা হুদেও এই আদেশ এ ভাষায়ই উল্লেখ হয়েছে।

তিন. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ অর্থাৎ দ্বীনের প্রচারের দায়িত্ব পালনে তুমি কারও বিরোধিতার পরওয়া করবে না। কে কি বললো, আর না বললো, তা দেখার তোমার কোন বিষয় নয়। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাবে।

চার. وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ অর্থাৎ 'তুমি ঘোষণা করে দাও যে, আল্লাহ্ তাআলা যতো কিতাব নাযিল করেছেন, সবগুলোর প্রতি আমি বিশ্বাস করি'। কোন কিতাবের উপরে আমার সামান্যতমও সন্দেহ-সংশয় নেই।

পাঁচ. وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ অর্থাৎ 'তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ন্যায় বিচার করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছে।' কেউ কেউ عَدْلٌ এর অর্থ করেছেন 'সাম্য'।

মাওলানা মওদুদী (রঃ) এই বাক্যের ব্যাখ্যায় তিনি কয়েকটি অর্থ করেছেন ঃ যেমন–

প্রথম অর্থ– এই যে, সকল প্রকারের দলাদলি ও কোন্দল-কোলাহল হতে সম্পূর্ণ আলাদা থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে ইনসাফের নীতি অনুসরণ করার জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি।

দ্বিতীয় অর্থ– এই যে, আমি যে সত্যকে তোমাদের সামনে পেশ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, তাতে কারো জন্য-ই কোনরূপ বিশিষ্টতা বা পার্থক্য নেই, সকলেরই জন্য সম্পূর্ণভাবে সমান। এতে আপন-পর, ছোট-বড়, গরীব-ধনী,

www.pathagar.com

ভদ্র ও উঁচু বংশ, অভদ্র ও নীচ বংশ এর জন্য আলাদা আলাদা অধিকার ঘোষিত হয়নি।

তৃতীয় অর্থ– এই যে, আমি দুনিয়ায় ইনসাফ কায়েম করার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হয়েছি। লোকদের মাঝে ইনসাফ করার জন্য আমাকে আদেশ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সমাজে যেসব বৈষম্য ও বেইনসাফী রয়েছে, আর রয়েছে ভারসাম্যহীনতা, তা সব কিছু দূর করার দায়িত্বও আমার।

চতুর্থ অর্থ– এই যে, আমি আল্লাহ্‌র নিয়োজিত বিচারক, বিচারপতি। লোকদের মাঝে পরিপূর্ণ ইনসাফ করা আমার দায়িত্ব। চারটি অর্থের মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থ মক্কার জন্য কার্যকরী এবং শেষের অর্থটি মক্কায় প্রকাশিত হয় নাই, হিজরাতের পর মদীনায় প্রকাশিত হয়েছে।

ছয়. اَللّٰهُ رَبُّنَا অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের সকলের রব পালনকর্তা।

সাত. لَنَآ اَعْمَا لُنَا وَلَكُمْ اَعْمَا لُكُمْ অর্থাৎ আমাদের কর্ম আমাদের কাজে আসবে। তোমাদের তাতে কোন লাভ-লোকসান হবে না এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের কাজে আসবে। আমাদের তাতে কোন লাভ ও ক্ষতি নেই। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলের জন্য নিজেরাই দায়ী থাকবো এবং নিজেদেরকে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবো। তোমরা যদি নেক আ'মল করো তবে তার ফল আমরা পাবো না, তোমরাই সেই ফল ভোগ করবে। আর আমরা যদি অন্যায় করি তবে তার প্রতিফল হিসেবে তোমাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না, আমাদের নিজেদেরকেই তার পরিনাম ভোগ করতে হবে। অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

অর্থাৎ (কিয়ামতের দিন) কেউ কারো ভার বহন করবে না। (আনআম-১৬৪)

আট. لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ অর্থাৎ সত্য স্পষ্ট ও প্রমাণিত হবার পরও যদি তোমরা শত্রুতাকেই কাজে লাগাও, তবে তর্ক-বিতর্কের কোন অর্থ নেই। কাজেই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এমন কোন বিতর্ক নেই।

www.pathagar.com

নয়. اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআ'লা আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যেকের কাজের প্রতিদান দেবেন।

দশ. وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ আমরা সকলেই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবো অর্থাৎ তাঁর কাছেই ফিরে যাবো।

দারসের সর্বশেষ আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

আল্লাহ্র দ্বীন মেনে নেবার পর যারা সে সম্পর্কে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে তাদের বিতর্ক ও দলীল প্রমাণ আল্লাহ্র কাছে বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য। তাদের উপর (দুনিয়াতে) তাঁর গযব এবং (পরকালে) কঠিন আযাব রয়েছে।

পূর্বের আয়াত সমূহে পয়গম্বরগণের সর্বসম্মত দ্বীনের প্রতি বিশ্ববাসীকে দাওয়াত প্রদান এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু যেসব কাফের শুনতে এবং মানতেই রাজী নয়, তারা এর পরেও মুসলমানদের সাথে বাক-বিতন্ডা শুরু করে দিতো। নব মুসলিমদের পেছনে আদা পানি খেয়ে লেগে যেতো, তাদেরকে নানা ভাবে জালা-যন্ত্রণা দিতো। শান্তিতে ঘরে থাকতে দিতো, না সমাজে থাকতে দিতো। তাদের উদ্দেশ্যেই ছিলো এই যে, মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়া। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে তৎকালীন ইহুদী নাসারারা এই বলে দাবী করতো যে, আমাদের নবী তোমাদের নবীর আগে এসেছে এবং আমাদের কিতাব তোমাদের কেতাবের আগে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্ম হতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কেউ কেউ বলেছেন এই বিষয়টি কোরাইশ কাফেরদের উত্থাপিত বলে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, তারা নিজেদেরকে প্রাচীন ধর্মের অনুসারী বলে মনে করতো।

আল কুরআনের উল্লেখিত আয়াত সমূহ বর্ণনা করছে যে, ইসলাম ও কুরআনের আবেদন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে এবং স্বয়ং তোমাদের জ্ঞানী-গুণী ও ন্যায়পন্থী লোকেরাও মুসলমান হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তোমাদের দ্বীন-এর

www.pathagar.com

ব্যাপারে বাক-বিতন্ডা করা অসার ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমাদের এই দাবী আল্লাহ্‌র কাছে বাতিল এবং অগ্রহণযোগ্য। তোমরা যদি এই দ্বীন না মান তাহলে তোমাদের উপর দুনিয়ায় গযব পড়বে এবং আখেরাতেও তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা শু'রা-র ১৩-১৬ নম্বর আয়াত সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করলাম। এখন অত্র আয়াতগুলো থেকে আমদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করছি।

● দ্বীন ইসলামই হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা।

● সকল নবীর দ্বীন একই দ্বীন ছিলো। পৃথক পৃথক নবীর জন্য পৃথক পৃথক দ্বীন ছিলো না একথাটিও অকাট্যভাবে বিশ্বাস করা।

● দ্বীনের যেসব বিধি-বিধান, আইন-কানুন যাকে শরীয়াত বলা হয় তা সকল নবীর জন্য একই ছিলো। তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা তারতম্য ছিলো মাত্র।

● আয়াতে উল্লেখিত পাঁচজন বিশেষ নবী-রাসূলসহ সকল নবী-রাসূলগণকে একই দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ মোতাবেক সকল নবী-রাসূলগণই দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। সুতরাং সর্বশেষ নবীর উম্মাত হিসেবে আমাদেরকেও আল্লাহ্‌র নবীর রেখে যাওয়া দ্বীন যা কুরআন এবং হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা চালাতে হবে।

● অতীতে যেমন কাফের,মুশরিক, ইহুদী এবং খৃষ্টানেরা দ্বীনের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে দ্বীন প্রতিষ্ঠা থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলো। আমরাও যেন অনুরূপভাবে দ্বীনের ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি করে দ্বীন প্রতিষ্ঠা থেকে দূরে সরে না যায়। এই জন্য জেনে নেওয়া দরকার দ্বীন কি এবং দ্বীনের মধ্যে যে শরীয়াত আছে তাও বা কি ? কেননা, ইসলাম বিদ্বেষী পাশ্চত্যবাদীদের দ্বীনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বর্তমানে আমাদের দেশ সহ সারা বিশ্বের নামধারী মুসলমানেরা ধর্ম এবং রাজনীতিকে পৃথক করে দিয়ে আল্লাহ্‌র মনোনীত পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা দ্বীন ইসলামকে খন্ডিত করে দিয়েছে।

● মক্কার মুশরিকদের জন্য যেমন পরিপূর্ণ দ্বীনের দাওয়াত গাত্রদাহ ও অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও এসব স্বার্থবাদী কাফের

www.pathagar.com

মুশরিকদের মতো অনেকের জন্যই তা অসহনীয় এবং গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাদের এই অসহনীয় এবং গাত্রদাহের কারণে দ্বীনের দাওয়াত বন্ধ করা যাবে না।

● আল্লাহ্‌র মনোনীত এবং বাছাইকৃত বান্দায় পরিণত হওয়ার জন্য প্রতিটি মুসলমানদের আল্লাহ্‌মুখী হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। কেননা যে আল্লাহ্‌মুখী হতে চায় না বা হয় না, আল্লাহ্ তাকে জোর করে আল্লাহ্‌মুখী বানান না। এটা আল্লাহ্‌র চিরাচরিত সুন্নত।

● মক্কার কাফের মুশরিকেরা আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এবং আসমানী কিতাব আল-কুরআন এর মাধ্যমে ইলম বা জ্ঞান আসার পরই দ্বীন সম্পর্কে যেমন তারা তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলো এবং নব মুসলিমদেরকে ঘরে-বাইরে উত্যক্ত করছিলো এটা তাদের জন্য অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ছিলো। বর্তমানে ওহীর জ্ঞান আল-কুরআন আমাদের সামনে উপস্থিত। সুতরাং অহীর এই নির্ভুল জ্ঞান পাবার পর দ্বীনের ব্যাপারে আর তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি করা সমীচীন নয় এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে ঘরে-বাইরে জ্বালাতন করে বাড়াবাড়ি করাও সঠিক নয়।

● যারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে বিতর্ক সৃষ্টি করে। দ্বীনের অনুসারীদের প্রতি যুলুম-নির্যাতন করে, আল্লাহ্ তাদের এই আচরণের জন্য তাৎক্ষণিক ভাবে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা পরীক্ষার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত এর ফায়সালা স্থগিত করে রেখেছেন।

● পূর্বের নবীর উপর অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে যেমনভাবে পরবর্তী নবী এবং কিতাবের উত্তর সূরীরা সন্দেহ-সংশয় পোষণ করতো, অনুরূপ ভাবে আমরা যেন অতীতের আসমানী কিতাব সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় পোষণ না করি।

● ১৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) কে আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে দশটি বিধানের আদেশ বা উপদেশ দিয়েছেন, আমরাও যেন উক্ত আদেশ বা উপদেশ গুলোকে আমাদের জন্য উপদেশ মনে করে আমল করি। যেমন–

১. বিরোধী শক্তির কাছে তাওহীদের দাওয়াত কঠিন মনে হলেও দাওয়াতী কাজ ছেড়ে না দিয়ে উপর্যপুরি দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়া।

২. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যেভাবে দ্বীনের প্রতি অবিচল থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে অবিচল এবং অটল থাকা।

www.pathagar.com

৩. দ্বীনের প্রচার করতে যেয়ে কে কি বললো না বললো সেদিকে না খেয়াল করা, বরং দ্বীনের প্রচারের যে দায়িত্ব রয়েছে তা দুর্বার গতিতে চালিয়ে যাওয়া।

৪. আল্লাহ্‌র ঘোষণা অনুযায়ী সকল আসমানী কিতাবকে বিশ্বাস করা এবং কোন কিতাবের ব্যাপারে সংশয় সন্দেহ পোষণ না করা।

৫. সকল ব্যাপারে এবং সকল ক্ষেত্রে– তা দ্বীনের ব্যাপারে হোক, অথবা মানুষের পরস্পরের মধ্যে দন্দ্ব-কলহের ব্যাপারে হোক, কিংবা হক বা সত্যতার ব্যাপারে হোক, অথবা মানুষের অধিকারের ব্যাপারে হোক, কিংবা বিচার-আচারের ক্ষেত্রে হোক, সকল ব্যাপারে যেন আমরা ন্যায় বিচার বা ইনসাফ কায়েম করতে পারি।

৬. একথা মনে করে নেওয়া যে আল্লাহ্ আমাদের সকলের রব, পালনকর্তা।

৭. আপন আপন কর্মের প্রতিফল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভোগ করবে। একজনের কর্ম-ফল অন্যজন ভোগ করবে না। প্রত্যেককেই আপন আপন হিসাব দিতে হবে।

৮. স্পষ্টভাবে সত্য প্রমাণিত এবং প্রকাশিত হওয়ার পর অহেতুক তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে শত্রুতা সৃষ্টি না করা।

৯. একথা মনে রাখতে হবে যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ আমাদের সকলকেই একত্রিত করবেন এবং প্রত্যেকের ভাল-মন্দ কাজের প্রতিদান-প্রতিফল দেবেন।

১০. একথাও স্মরণ রাখা যে, আমরা যে যাই করিনা কেন এবং যে যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের সকলকেই একদিন তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

একবার আল্লাহ্‌র দ্বীন যেনে বুঝে মেনে নেয়ার পর সে বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করা সমীচীন নয়। আর আল্লাহ্‌র কাছে এটা গ্রহণযোগ্যও নয়। যারা এ কাজ করবে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে দুনিয়াতে দিবেন গযব এবং আখেরাতে দিবেন চরম শাস্তি।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত সূরা শু'রা-র ১৩-১৬ আয়াত সমূহের যে ব্যাপক ব্যাখ্যা এবং শিক্ষা পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই আয়াতগুলোতে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষা রয়েছে তা যেন বাস্তব জীবনে আম'ল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। অয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

www.pathagar.com

চার

ঈমানের পরীক্ষা দিয়েই জান্নাতে যেতে হবে

(সূরা আনকাবুত-১-৭)

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ- اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا
وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ- وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ-
اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ
سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ- مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ
اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ- وَمَنْ جَاهَدَ
فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ-
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১) আলিফ-লা-ম মী-ম। (২) মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে ? আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না ? (৩) অথচ আমি তো ইতিপূর্বে যেসব লোক অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ্‌কে তো অবশ্যই জেনে নিতে হবে, কারা সত্যবাদী, আর কারা মিথ্যাবাদী। (৪) যারা মন্দ বা খারাপ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে রেহায় পেয়ে যাবে ? তারা খুব ভুল ও খারাপ ফায়সালাই করছে। (৫) যে কেউই আল্লাহ্‌র স্বাক্ষাৎ কামনা করে, (তাদের

www.pathagar.com

জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ্‌র সেই নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে। আর আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন এবং সবকিছু জানেন। (৬) যে যুদ্ধ সংগ্রাম করে সে নিজেরই কল্যাণের জন্য করে। আল্লাহ্ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া। (৭) আর যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের থেকে দূর করে দেব এবং তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের উৎকৃষ্টতম প্রতিদান দেব।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اَحَسِبَ النَّاسُ –লোকেরা কি হিসাব বা মনে করে নিয়েছে ? اَنْ يَّتْرَكُوْٓا –তারা অব্যাহতি বা ছাড়া পেয়ে যাবে ? يَقُوْلُوْ- –তারা বলে বা বলবে। اٰمَنَّا –আমরা বিশ্বাস করি। وَهُمْ–আর তাদেরকে। لَايُفْتَنُوْنَ –পরীক্ষা করা হবে না। وَلَقَدْ –অথচ নিশ্চয়ই। فَتَنَّا- –আমরা পরীক্ষা করেছি। اَلَّذِيْنَ –যারা। مِنْ–হতে বা থেকে। قَبْلِهِمْ–তাদের পূর্বের (লোকদের)। فَلَيَعْلَمَنَّ –আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে বা দেখে নেবেন। اللّٰهُ –সত্য বলেছে। صَدَقُوْا –মিথ্যাবাদীদেরকে। اَلْكٰذِبِيْنَ –তারা কি হেসাব বা মনে করেছে ? اَمْ حَسِبَ –তারা কাজ করেছে। يَعْمَلُوْنَ- –খারাপ বা মন্দ। سَيِّاٰتِ –তারা আমাকে ছেড়ে বা অতিক্রম করে যাবে। يَسْبِقُوْنَ –কত খারাপ বা মন্দ। سَآءَ –যা তারা ফায়সালা করেছে। مَنْ كَانَ مَا يَحْكُمُوْنَ- –যে কেউ। يَرْجُوْا –তারা কামনা করে। لِقَآءَ اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের। فان–অতঃপর নিশ্চয়ই। اجل الله –আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময়। لَاٰتٍ- অবশ্যই আসবে। وَهُوَ –এবং তিনিই। السَمِيْعُ –সবকিছু শুনেন। اَلْعَلِيْمُ- –সবকিছু জানেন। وَمَنْ এবং যে কেউ।

www.pathagar.com

جَاهَدَ –জিহাদ বা চেষ্টা সংগ্রাম করে। فَإِنَّمَا –শুধুমাত্র। يُجَاهِدُ –সে জিহাদ বা চেষ্টা সংগ্রাম করে। لِنَفْسِهِ–সে তার নিজের (কল্যাণের) জন্য। إِنَّ–নিশ্চয়ই। لَغَنِيٌّ –অবশ্যই ধনী বা মুখাপেক্ষীহীন। الْعٰلَمِيْنَ–বিশ্ব জাহানের। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا–এবং যারা বিশ্বাস করে। وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ –এবং যারা সৎ কর্ম করে। لَنُكَفِّرَنَّ –অবশ্যই আমি দূর করে বা মিটিয়ে দেব। عَنْهُمْ–তাদের থেকে। سَيِّاٰتِهِمْ –তাদের দোষ বা মন্দগুলো। لَنَجْزِيَنَّهُمْ –অবশ্যই তাদেরকে আমরা প্রতিদান দেব। اَحْسَنَ –অতি উত্তম। كَانُوْا–তারা করতেছিলো। يَعْمَلُوْنَ–তাদের আমল বা কাজের।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় দ্বীনদার/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সামনে দারস পেশ করার জন্য পবিত্র কালামে হাকীম আল কুরআনের সূরা আনকাবুতের-১-৭ আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তায়ালা যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিকভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। 'অমা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ'।

সূরার নামকরণ ঃ অত্র সূরার চতুর্থ রুকুর ৪১ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত الْعَنْكَبُوْتِ- (আনকাবুত) শব্দটিকে এই সূরার নাম হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। الْعَنْكَبُوْتِ শব্দটির অর্থ ঃ "মাকড়সা"। তবে এই নামকরণ করা হয়েছে সূরার কোন শিরোনাম হিসেবে নয়। বরং আল কুরআনের অন্যান্য সূরার ন্যায় এটিও 'প্রতীকী' বা 'চিহ্ন' হিসেবেই করা হয়েছে। তবে যা কিছুই করা হয়েছে তা অহীর নির্দেশেই করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নিজস্ব কোন মনগড়া হিসেবে নামকরণ করা হয়নি। আল কুরআনে সূরার নামকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা দারসে কুরআন 'প্রথম খন্ডে' উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিল বা অবতীর্ণ হবার সময়কাল ঃ আলোচ্য সূরাটি মাক্কী সূরা।

www.pathagar.com

তবে কোন কোন তাফসীরকারক সূরার প্রথমে মুনাফেকদের প্রসঙ্গ উল্লেখের কারণে সূরার প্রথম দশটি আয়াত মাদানী বলে মনে করেন। আর বাকী আয়াতগুলো মাক্কী। কেননা, মুনাফেকতো মক্কায় নয়, মদীনায় দেখা দিয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এটা সঠিক নয়। তার কারণ, এ সূরায় যেসব মুনাফেক লোকদের কথা বলা হয়েছে তারা তো সেই মুনাফেক যারা মক্কায় কাফেরদের যুলুম-অত্যাচার এবং কঠিন শারিরীক নির্যাতনের ভয়ে মুনাফেকী আচরণ অবলম্বন করেছিলো। আর এ ধরনের মুনাফেকী মক্কাতেই হতে পারতো মদীনায় নয়। অপর কিছু তাফসীরকারক এ সূরায় মুসলমানদেরকে হিজরাত করতে বলা হয়েছে দেখে এ সূরাটি মাক্কী জীবনের সর্বশেষ সূরা বলে মনে করেন। অথচ মদীনায় হিজরাত করার আগে তো মুসলমানেরা হাবশায়ও হিজরাত করেছিলেন। এসব ধারণা বশতঃ বক্তব্যের মূলে কোন হাদীসের প্রমাণ নেই। আসলে সূরাটি উল্লেখিত বিষয় ও বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেই এসব ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে। যদি আমরা সূরাটির সম্পূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে সামগ্রিক ভাবে চিন্তা বিবেচনা করি তাহলে বুঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী এবং মাক্কী জীবনের শেষে নয় বরং হাবশায় হিজরাতের আগে অবতীর্ণ বলেই প্রমাণিত হয়। কেননা, সূরার ৫৬-৬০ আয়াত হতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ সূরাটি মুসলমানদের হাবসায় হিজরাত করার কিছু পূর্বে নাযিল হয়েছিলো। (তার পরও আল্লাহ্ পাকই বেশী ভাল জানেন)।

সূরাটির মূল বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয় ঃ এ সূরাটি পড়লে মনে হবে যে, সূরাটি যে সময় নাযিল হয়েছিলো তখন মক্কায় মুসলমানদের উপর কঠোর নির্যাতন চালানো হচ্ছিল। কাফেরেরা পূর্ণ শক্তিতে ইসলামের বিরোধীতা করছিলো। নব মুসলিমদের উপর চরম যুলুম-নির্যাতন চালাতো। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা এ সূরাটি নাযিল করেন। এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা একদিকে সত্যিকার নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকদের দৃঢ় সংকল্প, অনড় মনোবল, সাহস-হিম্মত ও অনমনীয় মনোবল সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। অপর দিকে দূর্বল ঈমানদার লোকদেরকে লজ্জা দিতে চেয়েছেন। সেই সংগে মক্কার কাফেরদেরকে কঠোর ভাষায় শাসন করা হয়েছে। মক্কায় কাফের লোকেরা ঈমানদার যুবকদের ও নব মুসলিমদেরকে যেসব প্রলোভন এবং ভয়-ভীতি দেখিয়ে দমন করতে চেয়েছিলো আর আখেরাতের সকল জবাবদেহীতার দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে পেতে নিতে চেয়েছিলো এবং মুহাম্মদ (সঃ) এর দল ত্যাগের জন্য যেসব চেষ্টা-ফিকির করেছিলো তার জবাব দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

তাছাড়া এই সূরায় অতীতের নবীদের যেসব কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তাতেও ফুটে উঠেছে যে, অতীতের নবী-রাসূলদের উপর কঠোর এবং কঠিন বিপদ-আপদ নেমে এসেছে এবং দীর্ঘদিন ধরে তাদের উপর যুলুম-নির্যাতন চলেছে, তারপরও তারা আল্লাহ্‌র উপর টিকে থেকেছে এবং এক পর্যায়ে তাদের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য নেমে এসেছে। অতএব আপদ-বিপদ এবং যলুম-নির্যাতনের জন্য ঘাবড়ানো এবং ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহ্‌র সাহ-য্য অবশ্যই আসবে। তবে কঠিন পরীক্ষার একটা পর্যায় অতীক্রম করার পরই আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে। এর দ্বারা মক্কার মুসলমানসহ যুগে যুগে সকল মুমিন মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এই সূরার শেষের দিকে মুসলম-ানদেরকে আরও হেদায়াত করা হয়েছে যে, যুলুম ও নির্যাতন যদি তোমাদের পক্ষে সহ্য করা একান্তই অসম্ভব হয়েই পড়ে, তবে ঈমান ত্যাগ করার পরিবর্তে ঘর-বাড়ী এবং দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাও। আল্লাহ্‌র রাজ্যতো বিশাল। যেখানেই আল্লাহ্‌র বন্দেগী বিনা বাধায় করতে পারবে সেখানে চলে যাবে। কিন্তু তোমাদের ঈমান ত্যাগ করার কোন সুযোগ নেই।

দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য ঃ ঈমানের দাবী করলেই ঈমানদার হওয়া যায় না। ঈমানের দাবী পূরণের জন্য অবশ্যই আল্লাহ্ পরীক্ষা করবেন। মক্কার এই মুসলমানদের পূর্বে অতীতের নবী রাসূল এবং ঈমানদারদেরকেও পরীক্ষা করা হয়েছে। কেননা, ঈমানের প্রকৃত দাবীদার কারা আর কারা নয়, তার সত্য-মিথ্যা যাচাই করার প্রয়োজন রয়েছে। মন্দ কাজ করে আল্লাহকে ছেড়ে পার পেয়ে যাবে এটাও মনে করা সঠিক নয়। একটা নির্ধারিত সময়ই আল্লাহ্‌র সাথে তাদেরস্বাক্ষাৎ ঘটবে। আর যারা যুদ্ধ-জিহাদ, লড়াই-সংগ্রাম করে তারা নিজেদের কল্যাণের জন্যেই করে। কেননা, এসব কিছুর আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। আর ঈমানদারদের মধ্যে যারা ভাল–নেক কাজ করবে তাদেরকে আল্লাহ্ দুনিয়া এবং আখেরাতে উত্তম প্রতিদানও দেবেন। ১-৭ নম্বর আয়াতসমূহে এসব কথাই বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে দারসের জন্য তিলাওয়াতকৃত সূরা এবং আয়াতগুলোর প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করলাম। এখন আমি আপনাদের সামনে আয়াতে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ বাক্য এবং শব্দের ব্যাখ্যা পেশ করছি। সূরার শুরুতে মহান আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

الٓمٓ- 'আলীফ, লা-ম, মী-ম,' সূরা বাকারার মত উল্লেখিত এই সূরার الٓمٓ

www.pathagar.com

এই তিনটি অক্ষরকে 'হুরুফে মুকাত্তায়াত' বা 'বিচ্ছিন্ন অক্ষর' বলা হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনের সর্বমোট ২৯টি সূরার প্রথমে এ ধরনের 'বিচ্ছিন্ন অক্ষর' ব্যবহার করা হয়েছে। আল কুরআনে দু'ধরনের আয়াত বর্ণিত হয়েছে, তার একটি 'মুহকামাত' স্পষ্ট বা প্রকাশ্য অর্থবিশিষ্ট এবং অপরটি 'মুতাসাবিহাত' অস্পষ্ট বা অপ্রকাশ্য অর্থবিশিষ্ট। এই অক্ষরগুলো হলো 'মুতাসাবিহাত'। এসব বিচ্ছিন্ন এর্বং অস্পষ্ট অক্ষরের প্রকৃত অর্থ একমাত্র আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। তবে কোন কোন তাফসীরকারক ا দিয়ে اَنَا (আমি) ل –দিয়ে اَللّٰهُ এবং م -দিয়ে اَعْلَمُ (বেশী জানি) অর্থাৎ اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ "আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশী জানি'। আবার কোন কোন তাফসীর কারকের মতে ا দিয়ে اَللّٰهُ (আল্লাহ্) ل-দিয়ে جِبْرَائِيْلُ (জিবরাঈল) এবং م দিয়ে (মুহাম্মাদ সাঃ) কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট হতে জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে মুহম্মদ (সাঃ) এর কাছে এই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া আরো অনেক মনীষী ব্যক্তি এই অক্ষরগুলোর অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। তবে এসব অর্থের সবগুলোই অনুমান ভিত্তিক। ইসলামী শরীয়তে এগুলোর একটিও সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলে গৃহীত হয়নি। কেননা, এই অক্ষরগুলোর অর্থ হুযুর (সাঃ) উল্লেখ করে যাননি। সুতরাং এ অক্ষরগুলোর অর্থ জানার জন্য বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। প্রকৃত ঈমানদারদের জন্য এটা শোভনীয় নয়। অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ–

লোকেরা কি এই মনে করে নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বল-লেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে ? আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না ?

সূরার এই দ্বিতীয় আয়াতটির ব্যাখ্যার সুবিধার্থে জেনে নেয়া ভাল যে, কোন প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তাআলা এই কথাগুলি বলেছিলেন। তখন মক্কার অবস্থা এই ছিল যে, যেই ইসলাম কবুল করে রাসূলের দলে যোগদান করতো তার উপরই চরম বিপদ-আপদ ও যুলুম নির্যাতনের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। নওমুসলিম যদি

www.pathagar.com

গরীব কিংবা দাস-দাসী হতো, তা হলে তাকে অমানুষিক ভাবে মারপিট করা হতো এবং অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়া হতো। ছোট দোকানদার বা কারিগর কিংবা দিনমজুর ধরনের লোক হলে তার রুজি-রোজগারের সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হতো। আর যদি কোন ধনাঢ্য বা প্রভাবশালী পরিবারের লোক হতো তাহলে তার নিজের বংশ বা পরিবারের লোকেরা তাকে নানা ভাবে কষ্ট-ক্লেশ দিত এমনকি তার গোটা পরিবারকে ধ্বংস করে দিত। এরূপ অবস্থায় মক্কা নগরীর গোটা পরিবেশই ভয় ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছিলো। এই কারণে অনেকে নবী করীম (সাঃ) এর নবুয়তের সত্যতার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও ঈমান আনতে ভয় পেত। এই অবস্থায়ও কিছু লোক যখন ঈমান আনতো তখন তাদের উপর অসহনীয় যুলুম-নির্যাতন নেমে আসতো, ফলে তারাও সাহস হিম্মত হারিয়ে ফেলে কাফেরদের সামনে নতি স্বীকার করে বসতো। এই অবস্থায় মযবুত ঈমানদার লোকদের মানবীয় প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবীতে তাদেরও মধ্যে প্রায়ই কঠিনভাবে প্রাণ কেঁপে উঠতো, যদিও তারা ঈমানের দৃঢ় সংকল্প থেকে দূরে সরে যায় নাই।

উদাহরণ হিসেবে কর্মকার হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত এর বর্ণনা এখানে উল্লেখ করা যায় এবং সেই সময় পাক্কা মুমিনদের অবস্থা কেমন হয়ে পড়েছিলো তাও স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি বলেন ঃ যে সময় কাফের মুশরীকদের যুলুম-অত্যাচার ও নির্যাতনে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো, তখন একদিন আমি রাসূলে কারীম (সাঃ) এর সামনে উপস্থিত হলাম, তখন দেখি তিনি কাবা ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন। আমি তাঁর কাছে আরয করলাম 'হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি কি আমাদের (এই যুলুম-অত্যাচার থেকে উদ্ধারের) জন্য দোআ করেন না' ? আমার এই কথা শুনা মাত্রই নবী করীম (সাঃ) এর মুখমন্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করলো এবং দেয়ালে হেলান দেয়া থেকে সোজা হয়ে বসে বল-লেন ঃ শুনো! তোমাদের পূর্বে যেসব ঈমানদার লোকেরা চলে গেছে, তাদের উপর তো এর থেকেও অনেক বেশী কঠিন ও কঠোর যুলুম-নির্যাতন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কাউকে তো মাটিতে গর্ত খুঁড়ে কোমর পর্যন্ত পুঁতে মাথার উপর দিয়ে করাত চালিয়ে দ্বিখন্ডিত করে দেয়া হয়েছে। আবার কারও হাড়ের গোশত লোহার চিরুনী দিয়ে চেঁছে ফেলে দেয়া হয়েছে। আর এসবের মূলে একটাই কারণ ছিলো, তা হলো লোকদেরকে ঈমান থেকে ফিরে রাখা। (শুনো খাব্বাব!) আল্লাহ্‌র কসম এই কাজ– এই সাধনা (একদিন) পূর্ণ হবেই। এক সময় এমন হবে যে, এক ব্যক্তি একাই 'সানয়া' হতে 'হাজরা মউত' পর্যন্ত

www.pathagar.com

(বাংলাদেশে যেমন ব্যাপক দুরত্বের জন্য বলা হয়ে থাকে 'টেকনাফ' থেকে 'তেঁতুলিয়া'। অর্থাৎ মক্কার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত) নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে সফর করবে এবং এই সময় আল্লাহ্‌র ভয় ছাড়া আর কারও ভয় তাকে করতে হবে না। '(বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

এই দৈহিক নির্যাতন, মানসিক অস্থিরতা এবং কাতর অবস্থাকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পানি দিয়ে ঠান্ডা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলা তৎকালীন মক্কার ঈমানদার সহ যুগে যুগে সকল ঈমানদারকে বুঝাচ্ছেন এই বলে যে,

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يَّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ-

লোকেরা কি মনে করে নিয়েছে যে, ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে আর পরীক্ষা করা হবে না ?

অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা সম্পর্কে আমার যেসব ওয়াদা রয়েছে, তা কোনো ব্যক্তি ঈমানের মৌখিক দাবী করলেই পাবার অধিকারী হতে পারে না। বরং ঈমানের দাবীদার প্রত্যেককেই অবশ্যই কঠিন পরীক্ষায় পাশ করতে হবে এবং এভাবেই কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে নিজেদের ঈমানের সত্যতার প্রমাণ পেশ করতে হবে। আমার জান্নাত এতো সস্তা ও সহজলভ্য নয়, দুনিয়ায় আমার দান ও অনুগ্রহ লাভও এতো সহজে সম্ভব নয় যে, তোমরা মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করবে আর আমি অমনি সেইসব কিছুই তোমাদেরকে দান করে দেব। সেসব পেতে হলে পরীক্ষা অতি বড় শর্ত। সুতরাং এসব পেতে হলে তোমাদেরকে আমার জন্য কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, জান ও মালের ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, নানা ধরনের যুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে হবে। বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত, ঝামেলা-ঝুঁকি থেকে উদ্ধারের জন্য কঠোর এবং কঠিন ভাবে পাঞ্জা লড়তে হবে। তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে একদিকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে আর অন্যদিকে দেখানো হবে লোভ-লালসা। আমার সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদের অতি প্রিয় জিনিস কুরবান করতে হবে। যেসব কষ্ট তোমরা সহ্য করতে পারো না, তা আমারই জন্য তোমাদেরকে অকাতরে বরদাস্ত করতে হবে। এ সবের ভিতর দিয়েই আমার প্রতি ঈমানের যে দাবী তোমরা করছো তা সত্য না মিথ্যা, খাঁটি না কৃত্রিম তা প্রকাশ পেয়ে যাবে।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! বর্তমানে আমরা যারা ঈমানের দাবীদার আমরা কি মক্কার সেইসব খাঁটি মুমিনদের মতো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি ? আমরা কি

www.pathagar.com

কঠিন যুলুম ও নির্যাতনের স্বীকার হয়েছি ? আমরা কি মানুসিক ও দৈহিক যন্ত্রণা ও নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছি ? আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, আমাদের চাকরী, আমাদের আয়-রোজগারের কি পথ বন্ধ হয়ে গেছে ? আমাদের পরিবার এবং বংশের লোকেরা কি আমাদেরকে পরিবার ও বংশ থেকে বয়কট করেছে ? আমরা কি আল্লাহ্‌র জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে পেরেছি ? আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কি দুনিয়ায় আমাদের প্রিয় জিনিসগুলো কুরবান করতে পেরেছি ? আমরা ঈমানের যে দাবী করি তৎকালীন মক্কার ঈমানদারদের ঈমান ও জীবনের সাথে আমাদের মিলিয়ে দেখা উচিত। আমাদের দাবী সত্য না মিথ্যা তা যাচাই-বাচাই এর জন্য একটু আত্মসমালোচনা করে দেখা বাঞ্ছনীয়। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য ঈমানের দাবীদার পরীক্ষা তো দূরের কথা বরং বাতিল শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য খড়গহস্ত। আল্লাহ্‌র মহব্বত ভুলে গিয়ে দুনিয়ার মহব্বতে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। আমরা মুনাফেকদের ঈমানের দাবীর মতো কেবল আমরা ইমানের দাবীই করে থাকি। কিন্তু আমাদের ঈমান যাচায়ের জন্য কোন পরীক্ষা দিতে আমরা রাজী নয়। সস্তা ঈমানের দাবী করে ঝুঁকি মুক্ত কিছু সস্তা আমল করে আমরা জান্নাত যেতে চাই। আয়াতের এই দাবী অনুযায়ী আমাদের এই দাবী মিথ্যা। আমরা সব ভন্ড ঈমানের দাবীদার। অথচ আল-কুরআনে আমরা দেখতে পায় যেখানেই ঈমানের কথা বলা হয়েছে সেখানেই পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে।

ঈমানের এই পরীক্ষায় যখনই তাদের উপর বালা-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্টের প্রচন্ড আঘাত এসেছে এবং মুসলমানেরা ভয়ে প্রকম্পিত হয়েছে, ভীত-সন্ত্রস্ত ও কাতর হয়ে পড়েছে, সেইসব ক্ষেত্রে আল-কুরআনে এসব পরীক্ষার কথা বলে দেয়া হয়েছে। মক্কা থেকে হিজরতের পর মদীনায় প্রাথমিক জীবনকালে যখন মুসলমানেরা আর্থিক সংকট, বাইরের শত্রুদের আক্রমণ এবং মদীনার ভিতরে ইহুদী ও মুনাফিকদের শয়তানী, দুষ্টামী ও দুস্কৃতির কারণে খুব বেশী কাতর হয়ে পড়েছিলো, তখন আল্লাহ্ তাআলা সূরা বাকারার ২১৪ নম্বর আয়াতে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ
الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ
وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

www.pathagar.com

مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ۗ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ-

(হে মুমিনেরা!) তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে অথচ তোমাদের সেই অবস্থা এখনও হয়নি যা তোমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদার লোকদের হয়েছিলো। তাদের উপর এমন কঠোরতা করা হয়েছে এবং কষ্ট, নির্যাতন ও দুঃখ এসেছে যে তাদেরকে কাঁপিয়ে দেয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত (বাধ্য হয়ে) তৎকালীন রাসূল এবং তাঁর সংগী-সাথীরা ফরিয়াদ করে উঠেছে, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কবে কখন আসবে!' (তখন তাদেরকে শান্তনা দিয়ে বলা হয়েছে যে) জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র সাহায্য খুবই নিকটে।

অনুরূপভাবে ওহুদ যুদ্ধের পর মুসলমানদের উপর যখন আবার এক কঠিন বিপদ মুসীবতের সময় আসলো, তখন বলা হলো ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ-

তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা এমনিতেই বেহেশতে চলে যাবে? অথচ তোমাদের মধ্যে কে কে জিহাদে বীরত্ব ও সাহসের সাথে লড়াইকারী এবং কে কে ধৈর্য ধারণকারী; তা তো আল্লাহ্ এখনও (পরীক্ষা করে) দেখে নেননি। (আলে ঈমরান-১৪২)

এ সব অসংখ্য কুরআনের বাণীর মাধ্যমে যুগে যুগে সকল মুসলমানদের সামনে আল্লাহ্ তাআলা একটা মৌলিক সত্য বিষয় স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন যে, পরীক্ষা এমন একটা মানদন্ড, যাতে যাচাই করলে খাঁটি-অখাঁটি বা কৃত্রিম নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায়। যা কৃত্রিম-অখাঁটি তা আপনা-আপনি আল্লাহ্‌র পথ হতে সরে দাঁড়ায়। আর খাঁটি ও আসলটাকে ছেঁটে ও বেছে নেওয়া যায়। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা প্রকৃত ও সত্যিকার ঈমানদার লোকদের জন্য যেসব নিয়ামত ও পুরস্কার ঠিক করে রেখেছেন, তা ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লোকেরাই পেতে পারবে। অতএব প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমাদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওয়াদাকৃত নিয়ামত ও জান্নাত লাভের জন্যে সদা-সর্বদা দুনিয়ার জীবনে ঈমানকে যাচাই-বাচাই-এর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতের প্রথম অংশে মহান আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন ঃ

www.pathagar.com

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

অথচ আমি তো এদের পূর্বেকার সকল লোককেই পরীক্ষা করেছি।

অর্থাৎ মক্কার হে নির্যাতিত ঈমানদার লোকেরা! এটা কোন নতুন বিষয় নয় যে, কেবল তোমাদের প্রতিই এরূপ নতুন নীতি অবলম্বন করে পরীক্ষা করা হচ্ছে। আসলে এটা সঠিক নয়। ইতিহাসে এটা নতুন কোন সংযোজন নয়। চিরদিনই এরূপ করা হয়েছে। যে বা যারাই ঈমানের দাবী করেছে তাদেরকেই কঠিন অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এমনকি নবীদেরকেও ছেড়ে দেওয়া হয়নি। হযরত নূহ নবীকে তাঁর নিজের সন্তান ও জাতির লোকেরা নবুয়ত মেনে না নিয়ে কঠিন জালাতন করেছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে দফায় দফায় পরীক্ষা করা হয়েছে। এমনকি টগবগে জলন্ত আগুনে তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) কে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে জেলে-পুরে পরীক্ষা করা হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) কে ফেরাউনের দ্বারা চরম ভাবে নির্যাতিত হতে হয়েছে এবং নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। হযরত লূত (আঃ)কেও তার নিজের পরিবার এবং জাতির লোকেরা মানসিক ভাবে নির্যাতন করেছে। হযরত আইয়ুব (আঃ)কে দীর্ঘ ১৮ বছর বালা-মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)কে তার জাতির লোকেরা হত্যার জন্য শুলে চড়িয়েছে। এমনি ভাবে বনী ঈসরাঈলের শত শত নবীকে যুলুম নির্যাতন করা হয়েছে। এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু কোন নবী বা পয়গম্বর এসব পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন নাই। প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হিসেবে ধৈর্যের সাথে সবকিছু মোকাবেলা করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিল করেছেন। সুতরাং হে মুমিনেরা, জেনে রাখ অতীতের ঈমানদার লোক এমনকি নবীদেরকেও যেহেতু ঈমানের পরীক্ষা থেকে ছাড় দেওয়া হয়নি এবং পরীক্ষার মাধ্যমেই তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিয়ামত এবং জান্নাত দেয়া হয়েছে। অতএব তোমাদের আর কিইবা বিশেষত্ব রয়েছে যে, তোমাদের শুধু ঈমানের মৌখিক দাবীর দরুন কোনরূপ পরীক্ষা ছাড়াই সাহায্য ও বিজয় দান করবো এবং জান্নাত দিয়ে দেব ?

আয়াতের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ–

আল্লাহ্‌কে তো অবশ্যই জেনে বা দেখে নিতে হবে যে, কে ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী, আর কে মিথ্যাবাদী।

www.pathagar.com

فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ – এর শাব্দিক তরজমা হলো ঃ 'অবশ্যই আল্লাহ্ জেনে নিবেন।' এ কথার দ্বারা কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, কে খাঁটি ও সাচ্চা আর কে অখাঁটি, কৃত্রিম ও মিথ্যাবাদী তা তো আল্লাহ্ নিজেই জানেন। তাহলে আবার আল্লাহ্র জেনে নেয়ারই বা কি প্রয়োজন হতে পারে ? এর উত্তর এই যে, কোন লোকের মধ্যে হয়ত কোন কাজ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা আছে, কিন্তু তা যতক্ষণ পর্যন্ত কার্যত প্রকাশিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইনসাফ ও সুবিচারের দাবী অনুযায়ী সে কোন প্রকারের প্রতিদান হিসাবে পুরুস্কারও পেতে পারে না, শাস্তিও পেতে পারে না।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ধরুন ঃ এক ব্যক্তির মধ্যে আমানতদার হবার যোগ্যতা আছে, আর এক জনের মধ্যে রয়েছে খেয়ানতকারী হবার যোগ্যতা। এখন এই দুইজনের উপর পরীক্ষা না আসা পর্যন্ত একজনের আমানতদারী ও অপরজনের খিয়ানতকারী হিসেবে বিশ্বাস ভংগের 'গুনের' বাস্তব প্রকাশ ঘটা না পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁর গায়েবী ইলমের ভিত্তিতে একজনকে আমানত দারীর পুরষ্কার এবং অপরজনকে খিয়ানতকারী হিসেবে শাস্তি দিয়ে দেবেন এটা আল্লাহ্র নীতির সম্পূর্ণ খেলাফ। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালা কারো ভাল গুন আছে জানার পরও বাস্তবে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকাশ না করে যেমন পুরস্কার দেন না। তেমনি কারও মধ্যে যে খারাপ গুন আছে জানার পরও তা কার্যত সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে শাস্তিও দেন না। তাছাড়া এটাও একটা বিষয় তাহলো এই যে, সাধারণ মানুষ বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমেই কিন্তু ভাল-মন্দ জেনে থাকে। সুতরাং আল্লাহ্ জেনে থাকলেও সাধারণ মানুষের মাঝে তা প্রকাশের জন্যও সত্য-মিথ্যা যাচায়ের জন্য পরীক্ষা করে থাকেন। فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ এর শাব্দিক অর্থ 'আল্লাহ্ জেনে নিবেন' এর পরিবর্তে করা হয়েছে 'আল্লাহ্ দেখে নেবেন।' অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা মানুষের ভাল-মন্দ গুন জানার পরও ইনসাফ এবং নীতির দাবী অনুযায়ী বাস্তবে দেখে নেবেন বা যাচাই করে নেবেন।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ তাআলা পরবর্তী আয়াতে বলেন ঃ

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ أَنْ يَّسْبِقُوْنَا ط سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

যে সব লোক মন্দ ও খারাপ কাজ করছে তারা কি একথা মনে করে নিয়েছে

www.pathagar.com

যে, তারা আমার হাত থেকে রেহায় পেয়ে যাবে ? আসলে তারা খুব ভুল ও খারাপ ফয়সালাই করছে।

আয়াতের প্রথমাংশ اَلَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ السَّيِّاٰتِ যারা বা যেসব লোক খারাপ বা মন্দ কাজ করছে। অর্থাৎ যারাই আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে। কিন্তু এখানে বিশেষ ভাবে মক্কার কুরাইশ বংশের অত্যাচারী নেতাদের প্রতি লক্ষ্য করেই কথাটি বলা হয়েছে, যারা ইসলামের বিরোধীতায় এবং ইসলাম কবুলকারী মুসলমানদের উপর যুলুম অত্যাচার চালানোর ব্যাপারে খুবই অগ্রগামী ছিলো। যেমন– অলীদ ইবনে মুগীরা, আবু জেহেল, উৎবা, শাইবা, উকবা, হানযালা ইবনে মগীরা এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কথার পূর্বাপর বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করলে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুসলমানদের কঠিন পরীক্ষায় ধৈর্য-সহ্য ও দৃঢ়তা দেখাবার উপদেশ দেবার পর যারা এই সত্য পথ যাত্রীদের উপর যুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে তাদেরকে সম্বোধন করে এখানে কঠোর ভাষায় প্রয়োজনীয় দু'একটি কথা বলে দেয়া হয়েছে।

اَنْ يَّسْبِقُوْنَا শব্দের মূল অর্থ হলো ঃ 'আমাকে ছাড়িয়ে যাবে' আবার এই অর্থও করা যেতে পারে যে, 'আমার পাকড়াও হতে বেঁচে কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে।'

يَسْبِقُوْنَا "আমাকে ছেড়ে যাবে।" এটি দু'টি অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথম অর্থটি হলো ঃ আমি যা করতে চাই, রাসূলের আন্দোলনের সাফল্য ঘটাতে চাই– তা তো হতে পারবে না, আর যা এই লোকেরা আমার রাসূলকে পরাজিত করতে চায়, তা সফল হবে। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো ঃ তারা যে (ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে) বাড়াবাড়ি করছে, আমি বুঝি তাদেরকে পাকড়াও করতে পারবো না। তারা পালিয়ে আমার হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবে।

سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ "তারা বড়ই ভুল ও খারাপ ফায়সালাই করতেছে।" অর্থাৎ তারা তথা কাফের মুশরিকেরা মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতন করবে অথচ আমার হাতে ধরা পড়বে না, আমার ক্ষমতার বাইরে অবস্থান করবে এটা মনে করা বোকামীর পরিচয়। তাদের এই ধরনের মানসিকতার ফায়সালাটা আসলে বড়ই ভুল ও অন্যায়।

www.pathagar.com

অতঃপর মহান আল্লাহ্ পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করে বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۭ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ–

যে কেউই আল্লাহ্র সাথে স্বাক্ষাৎ লাভের কামনা করে, (তাদের জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ্র সেই নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে। আর আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন।

অর্থাৎ যে সব লোক পরকালীন জীবন আছে বলে বিশ্বাসই করে না, নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে বলে আদৌ বিশ্বাস করে না এবং নিজেদের কাজ-কাম সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে কেউ কৈফিয়ত বা হিসাব-নিকাশ নিতে পারে এমন কোন শক্তি আছে বলেই মনে করে না, তাদের ব্যাপার তো সম্পূর্ণ আলাদা। সে নিজের গাফলতিতে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাক এবং নিশ্চিন্তে যা ইচ্ছা তাই করতে থাকুক। সে তার নিজের চিন্তা ও কাজের ফল নিজেই পরিনামে ভোগ করবে। কিন্তু কথা হলো, যারা একদিন আল্লাহ্র সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজেদের আমলের অনুপাতে পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করতে হবে বলে আশা পোষণ করে, তাদের এটা মনে করা উচিত নয় যে, মৃত্যু বুঝি অনেক দূরে। বরং মৃত্যুকে তো খুবই নিকটে উপস্থিত বলে মনে করা উচিত।

তাদের তো মনে করা উচিত যে, দুনিয়ার এই জীবন, কাজের সময় ও সুযোগ খুব বেশী দীর্ঘ নয়। অতএব পরকালের উপকারের জন্য যা কিছু করা দরকার তা অতি শীঘ্রই করে নেয়া উচিত। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার ভিত্তিহীন কল্পনা করে বসে থেকে নিজের সংশোধন না করা কিছুতেই উচিত হতে পারে না। কখন কোন সময় মৃত্যু আসে এটা আল্লাহ্ তায়ালাই ভাল জানেন। সুতরাং আল্লাহ্র সাথে স্বাক্ষাতের জন্য যে নির্ধারিত সময় আছে সেটার কোন পরিবর্তন হবে না, যা আমাদের অজানা। সুতরাং মৃত্যুকে সব সময় সামনে নিয়ে দুনিয়াতে চলা উচিত এবং পারলৌকিক সফলতার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য আমল করা উচিত।

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ **আর তিনি সবকিছুই শুনেন এবং সবকিছুই জানেন।** অর্থাৎ তাদের এই ভুল ধারণায় পড়ে থাকা উচিত নয় যে, তাদের ব্যাপার বুঝি কোন বে-খবর রাজা-বাদশাহর সংগে। আসলে, যে আল্লাহ্র

www.pathagar.com

সামনে তাদেরকে হাজির হতে হবে এবং জবাবদিহি করতে হবে তিনি কোন বে-খবর আল্লাহ্ নন। তিনি তো সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন, তাদের কোন কথাই আল্লাহ্র নিকট গোপন থাকে না। অতঃপর পরবর্তী আয়াতের প্রথমাংশে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ

এবং যে কেউ জিহাদ করে সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই জিহাদ করে।

مُجَاهِدَةٌ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। مُجَاهِدَةٌ বলা হয়– কোন বিপরীত শক্তির সাথে দ্বন্দ্ব-সুংগ্রামে লিপ্ত হওয়া, চেষ্টা-সাধনা করা, অবিরাম চেষ্টা-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াকে। আল-কুরআনে যদি কোন বিশেষ শক্তির কথা না উল্লেখ করেই এ শব্দটির ব্যবহার করা হয়, তখন এর অর্থ হয়, এটা এক সাধারণ, সর্বাত্মক, সর্বদিক ব্যাপী চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম। মু'মিন লোকদেরকে এই দুনিয়ায় যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম করতে হয়, তাও ঠিক এমনি ব্যাপার। তাকে অসংখ্য ভিতর এবং বাইরের শত্রুর সাথে মোকাবেলা করতে হয়। যেমন ঃ

(i) মানুষের চির প্রতিদ্বন্দ্বি শত্রু শয়তানের সাথে সংগ্রাম করতে হয়। কেননা, সে প্রতি মুহূর্ত নেক ও কল্যাণকর আমলের ক্ষতিকর পরিনামের কথাই বলে বেড়ায়। আর বদ বা খারাপ আমল বা কাজের সব ধরনের ফয়দা ও সুযোগের লোভ দেখায়।

(ii) মুমিনকে তার নিজের নাফসের বা কুপ্রবৃত্তির সাথেও লড়াই সংগ্রাম করতে হয়। কেননা, এই নফসই সদাসর্বদা তাকে তার লালসা-বাসনা, ভোগ-বিলাস ও খাহেশের দাস বানিয়ে দেবার চেষ্টা চালায়।

(iii নিজের ঘর থেকে সমাজের বহু মানুষের সাথে তাকে লড়াই-সংগ্রাম করতে হয়। কেননা, এরাই দুনিয়ার মোহে খোদা বিমুখ করে ছাড়ে।

(iv) পূর্ব পুরুষের রেশম-রেওয়াজের বিরুদ্ধেও তাকে লড়াই করতে হয়। যে রেশম-রেওয়াজ তাকে খোদা বিমুখ করে দেয়।

(v) তাকে লড়াই করতে হয়, প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা, মতাদর্শ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও দ্বীন ইসলামের বিপরীত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে।

(vi) তাকে লড়াই করতে হয়, খোদা বিমুখ রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং শাসকদের বিরুদ্ধে। আর এই সংগ্রাম সাধনা এক দুই দিনের জন্য নয়। এই সংগ্রাম সারা জীবনের জন্য। এই সংগ্রাম প্রতি রাত-দিনের প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি মিনিট এবং প্রতিটি ঘন্টার জন্যে। এই সংগ্রাম অবিরাম সংগ্রাম। এই সংগ্রাম বিশেষ

www.pathagar.com

কোন একটি ময়দানে নয়। জীবনের প্রতি দিকে ও প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই সংগ্রাম চালাতে হয়। হযরত হাসান বসরী (রঃ) এই কথায় বলেছেন যে,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُجَاهِدُ مَا ضَرَبَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ بِسَيْفٍ

মানুষ অবিরাম জিহাদ করতেই থাকে- হয়তবা সে একবারও তরবারী ব্যবহার করেনি।

জিহাদ তো ততক্ষণ চলবে ঃ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ **তোমরা তাদের (খোদাদ্রোহীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ তথা সংগ্রাম করতে থাকো, যতক্ষণ পর্যন্ত না ফেৎনা-ফাসাদ ও সন্ত্রাস নির্মুল হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েম হয়ে যায়। (সূরা আনফাল-৩৯)**

এরূপ সার্বক্ষণিক ও সর্বাত্মক জিহাদ চালাবার জন্য আল্লাহ্ তাআলা যে উপদেশ দিচ্ছেন, এটা তার নিজের কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মনে হয় তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন। এতে বুঝি আল্লাহ্‌র কোন কল্যাণ আছে। বরং এই জিহাদে যা কল্যাণ আছে তা জিহাদকারীর জন্যেই আছে। জিহাদ করার জন্য যেমন সে দুনিয়াতে কল্যাণ লাভ করবে, তেমনি সে আখেরাতেও চিরকল্যাণ লাভ করে জান্নাতবাসি হবে। সুতরাং যে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ-সংগ্রাম করে সে তার নিজের জীবনের কল্যাণের জন্যেই করে। এতে তার নিজেরই কল্যাণ রয়েছে। জিহাদ করা না করাতে আল্লাহ্‌র কোন লাভও নেই ক্ষতিও নেই। যা লাভ ক্ষতি তা মানুষেরই।

إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ **নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন।**

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ্ দুনিয়া-জাহানের কারও কোন বিষয়ের ব্যাপারে মুখাপেক্ষী নন। তিনি গানী, ধনী, মুখাপেক্ষীহীন। মানুষ যদি দুনিয়ায় জান-প্রাণ সব কিছু দিয়ে সার্বক্ষণিক ও সর্বাত্মক জিহাদ না করে তাহলে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আল্লাহ্ কোন কিছুর কাঙ্গাল নন। বরং মানুষেরাই কাঙ্গাল। মানুষেরই কল্যাণের প্রয়োজন। মানুষেরা যদি আল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

নির্দেশ অনুযায়ী সব কিছু আমল করে তাহলে মানুষেরাই দুনিয়াতে যেমন উপকৃত হবে, তেমনি আখেরাতেও আল্লাহ্‌র ভয়াবহ 'আযাব থেকে নিস্তার পেয়ে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত লাভ করবে। আর যদি জিহাদ না করে তাহলে দুনিয়ায় যেমন গযব-আযাব এবং অশান্তি ভোগ করবে, তেমনি আখেরাতেও জাহান্নামের কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়ে চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং মানুষ যদি সবাই মিলে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মতো চলে, তাহলে আল্লাহ্‌র যেমন চুল পরিমাণও লাভ নেই। তেমনিভাবে সকল মানুষও যদি কুফরী করে গোমরাহ হয়ে যায়, তাতেও আল্লাহ্‌র এক চুল পরিমাণ ক্ষতি নেই। আল্লাহ্ সবকিছু থেকে বেপরোয়া।

অতঃপর দারসের সর্বশেষ আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে, (এর কারণে) আমি তাদের ত্রুটিগুলো দূর করে দেব এবং তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের প্রতিফল দান করবো।

আয়াতে 'ঈমান আনা' বলতে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর কিতাব আল-কুরআনে যেসব জিনিস মেনে নেওয়ার আহবান জানানো হয়েছে সেই সব কিছুকেই আন্তরিক ভাবে মেনে নেয়া।' আর عَمَلٌ صَالِحٌ (আমলে সলেহ) বা নেক বা সৎ কাজ বলতে বুঝায়, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পেশ করা বিধান ও সুন্নত অনুযায়ী আমল বা কাজ করা।

নেক বা সৎ কাজের মাধ্যম ঃ

(i) মন ও মগযের নেক বা সৎ আমল হলো ঃ ব্যক্তির চিন্তা-বিশ্বাস, মনোভাব আদর্শ ও লক্ষ্য এবং ইচ্ছা ও বাসনা নির্ভুল, সততাপূর্ণ, পরিচ্ছন্ন ও পুতপবিত্র হওয়া।

(ii) মুখের বা কথার নেক আমল হলো ঃ অসৎ, কুৎসিত, অশ্লীল ও সত্যের বিপরীত কোন কথা মুখে উচ্চারণ না করা। যে কথাই বলবে, তা সত্য, ইনসাফ, শালীন ও ন্যায় কথাই বলবে।

(iii) দেহের অংগ-প্রত্যংগের নেক আমল হলো ঃ ব্যক্তি সমগ্র জীবনটাকে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্যের অধীনে পরিচালিত করবে এবং তাঁর

www.pathagar.com

আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের বিপরীত কোন কাজ করবে না।

যেসব ব্যক্তি এই তিনটি মাধ্যম যেমন– চিন্তা-চেতনা, কথা এবং বাস্তব কর্মের দ্বারা নেক বা সৎ আমল করবে তাদের জন্যে দু'টি প্রতিদান দেয়া হবে বলে আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে। আর তা হলো–

প্রথম প্রতিদান হলো ঃ মানুষের ভিতরে ও চরিত্রে যেসব দোষ-ত্রুটি আছে, তা দূর করে দেওয়া হবে। দোষ-ত্রুটি দূর করে দেয়ার কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি হলো, ঈমান আনার আগে সে যে রকমই গুনাহ করে থাকুক না কেন, ঈমান আনার সংগে সংগে তা সবই মাফ হয়ে যাবে।

অপরটি হলো, ঈমান আনার পর বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে নয় বরং মানবীয় দুর্বলতার কারণে যেসব পাপ বা অপরাধ করেছে, তা তার নেক আমলের প্রতি খেয়াল করে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর তৃতীয়টি হলো, ঈমান ও সৎ আমলের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করায়, ব্যক্তির নফসের সংশোধন আপনা-আপনি হয়ে যাবে এবং এর ফলে তার অনেক প্রকারের দুর্বলতা এমনি এমনি দূর হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রতিদান হলো ঃ তার দুনিয়ার উত্তম আমল বা কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে এবং সেই উত্তম প্রতিফল হবে তার সেই উত্তম আমলের অপেক্ষাও অনেক অনেক গুণ উত্তম ও উন্নত মানের।

ঈমান ও নেক আমলের প্রতিফল দেওয়া সম্পর্কে যে কথাটুকু বলা হয়েছে, তা হলো ঃ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ এই বাক্যাংশের দুটি অর্থ হতে পারে। একটি এই যে, ব্যক্তির নেক আমলের মধ্যে যেসব আমল সবচেয়ে বেশী ভাল ও উত্তম হবে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তার জন্য প্রতিফল নির্ধারণ করা হবে। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, ব্যক্তি নিজের আমলের অনুপাতে যতটুকু প্রতিদান পাবার যোগ্য হবে তার থেকেও বেশী উত্তম প্রতিফল তাকে দেয়া হবে। এর স্বপক্ষে কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও তা উল্লেখ রয়েছে। যেমন সূরা আনয়ামের ১৬০ আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا -যে ব্যক্তি নেক আমল নিয়ে আসবে, তাকে তার চেয়ে দশগুণ প্রতিফল দেওয়া হবে।

অনুরূপ সূরা কাসাসের ৮৪ আয়াতে বলা হয়েছে–

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি নেক আমল নিয়ে আসবে তাকে তার থেকেও উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে।

সূরা নিসার ৪০ আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا

নিশ্চয় আল্লাহ্ একবিন্দু পরিমাণও যুলুম করেন না। যদি নেক আমল হয়, তবে তিনি তাকে কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে (প্রতিদান) দেন।

মোট কথা বান্দার আমলের প্রতিদানের বৃদ্ধিটা সৎ কাজ এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার উপর নির্ভর করে। আর নেক বান্দার জন্য আখেরাতের সর্বোচ্চ প্রতিদান হলো, নিয়ামতে পরিপূর্ণ চির সুখময় জান্নাত এবং মহান আল্লাহ্র দিদার।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়ার এই জীবনে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য (চিন্তার দিক থেকে, কথার মাধ্যমে এবং বাস্তবে) উত্তম আমল করার তৌফিক দান করুন এবং আখেরাতে আদালতে অতি উত্তম প্রতিদান জান্নাতুল ফেরদাউস ও আল্লাহ্র দিদার লাভের সুযোগ করে দিন। আমিন।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা। এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আনকাবুতের ১-৭ আয়াত পর্যন্ত ব্যাখ্যা পেশ করলাম। এর মধ্যে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষা রয়েছে তা হলো ঃ

● الٓمٓ এর মতো হুরুফে 'মুকাত্তাআত' বা বিচ্ছিন্ন শব্দের অর্থ জানার জন্য পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং আঁতি পাঁতি করে খোজা-খুজিরও কোন দরকার নেই।

● ঈমানের দাবী করাটাই যথেষ্ট নয়। বরং জান-মালসহ বৈষয়িক সকল কিছুকে কুরবানীর মাধ্যমে ঈমানকে পরীক্ষা করা হবে এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে সদা-সর্বদা পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা।

● স্বর্ণকার যেমন খাঁটি স্বর্ণ বের করার জন্য সোনার খন্ডকে জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে খাদ বের করে ফেলে, অনুরূপ ভাবে আল্লাহ্ তাআলাও দুনিয়াতে বিভিন্ন

www.pathagar.com

অগ্নি পরীক্ষার মাধ্যমে ঈমানের দাবীদারদের মধ্যে থেকে খাঁটি ঈমানদারদের বাছাই করেন। এটাই আল্লাহ্‌র চিরাচরিত নিয়ম ও বৈশিষ্ট। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

● শুধু যে রাসূলের সঙ্গী সাথী এবং উম্মতে মুহাম্মদীকে ঈমানের পরীক্ষা দিতে হয়েছে বা হবে তা নয়। বরং ইতিপূর্বে যতো নবী এসেছেন সকলকেই এবং আপন আপন নবীর জাতির লোকদেরকেও পরীক্ষা করা হয়েছে। এটা এই জন্যই করা হয়েছে যে, ঈমানের দাবীতে কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী তা যাচাই-বাচাই করা। সুতরাং যুগে যুগে সকল ঈমানের দাবীদারদের সত্য-মিথ্যা যাচায়ের জন্য আল্লাহ্‌ পরীক্ষা করে নিজে যেমন দেখে নিবেন তেমনি মানুষের কাছেও প্রকাশ করে ছাড়বেন। কেননা, আল্লাহ্‌কে যেমন দেখে নিতে হবে তেমনি মানুষের কাছেও প্রকাশ পেতে হবে।

● ঈমানদারদের এটাও ভালভাবে জেনে নেওয়া দরকার যে, সত্য-মিথ্যা যাচাই এবং খাঁটি-অখাঁটি যাচায়ের মাধ্যমই হলো আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ-যথা ইসলামী আন্দোলন। কোন খানকায় বসে বা মসজিদে মসজিদে ঘুরে-ফিরে নিরাপদ দূরত্বে থেকে ঈমানের পরীক্ষা দেয়া সম্ভব নয়।

● ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য যেসব শয়তানী ও কুফর শক্তি যুলুম-নির্যাতন করে, তারা মনে করে যে, আল্লাহ্‌কে ফাঁকি দিয়ে তারা পার পেয়ে যাবে। আসলে এটা তাদের অমূলক ও ভুল ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং তাদেরকে দুনিয়ার এই আচরণের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। তারা কোন ভাবেই পার পাবে না।

● আল্লাহ্‌র স্বাক্ষাতের জন্য তাড়াহুড়ো করাও যেমন ঠিক নয়, তেমনি মৃত্যু কখন আসবে এই বলে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকাও ঠিক নয়। বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়ই মৃত্যু হবে, যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌রই আছে। এজন্য সময় ক্ষেপন না করে প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। কেননা, মহান আল্লাহ্‌ পাক আমাদের সবকিছুই শুনে থাকেন এবং সব কিছুই পরখ করে থাকেন।

● যে সার্বক্ষণিক এবং সর্বাত্মক জিহাদ করে তা আল্লাহ্‌র কোন উপকার বা

www.pathagar.com

স্বার্থের জন্য করেনা। বরং সে নিজের জীবনের স্বার্থ ও কল্যাণের জন্যই করে থাকে। জিহাদ করলে ব্যক্তির নিজেরই লাভ না করলে নিজেরই ক্ষতি। এতে আল্লাহ্‌র কোন লাভও নেই ক্ষতিও নেই। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা সব কিছু থেকেই অভাবমুক্ত।

● প্রতিটি মুমিনের চিন্তা-চেতনা, কথা-বার্তা, এবং কাজ-কাম নেক এবং সৎ হতে হবে, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের ঈমান এবং সৎ কাজের বিনিময়ে মানবীয় কারণে যেসব দোষ-ত্রুটি হয়ে যায়, তা দূর করে দেবেন। আর দুনিয়ায় উত্তম কাজের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাআলা আরও অতি উত্তম প্রতিফল দেবেন। আর তা হলো আল্লাহ্‌র দিদার এবং অতি উত্তম জান্নাত।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে সূরা আনকাবুতের প্রথম সাতটি আয়াত থেকে যে দারস পেশ করলাম, এতে যদি আমার অজান্তে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায় সেই জন্য মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষনীয় বিষয় আমরা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। মাআসসালাম।

www.pathagar.com

পাঁচ

আল্লাহ্‌র উপর অবিচল ঈমান।
সর্বোত্তম পন্থায় দাওয়াত দান ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন

(সূরা হা-মীম আস সিজদা-৩০-৩৬)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ - نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ- نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ- وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ- وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ- وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ-

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (৩০) নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব (পালনকর্তা) আল্লাহ্, অতঃপর তাতেই অটল-অবিচল থাকে। তাদের কাছে ফিরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে বলে, তোমরা ভয় পেও না, চিন্তাও

www.pathagar.com

করো না। আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও, যার ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হয়েছিলো। (৩১) ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে (জান্নাতে) তোমাদের জন্যে আছে যা তোমাদের মনে চায় এবং সেখানে তাও আছে যা তোমরা দাবী করো। (৩২) এটা হলো ক্ষমাশীল ও দয়াময় আল্লাহ্‌র তরফ হতে মেহমানদারীর সামগ্রী। (৩৩) আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অতি উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়, নিজে সৎ কাজ করে, এবং বলে, 'আমি মুসলমান' ? (৩৪) (আর হে নবী!) ভাল ও মন্দ সমান নয়। তুমি অন্যায় ও মন্দকে দূর করো সেই ভালো দ্বারা যা অতি উত্তম। তাহলে দেখবে যে, তোমার সাথে যার শত্রুতা ছিলো সে হয়ে গেছে অন্তরঙ্গ বন্ধু। (৩৫) এ গুণ কেবল তাদেরই আছে, যারা ধৈর্য ধারণ করে। আর এই মর্যাদা লাভ করতে পারে কেবল তারাই যারা বড়-ই ভাগ্যবান।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ إِنَّ –নিশ্চয়। اَلَّذِيْنَ –যারা। قَالُوْا–তারা বলে। رَبُّنَا–আমাদের রব বা প্রতিপালক। ثُمَّ –অতঃপর। اِسْتَقَامُوْا –তারা অটল অবিচল থাকে। تَتَنَزَّلُ –অবতীর্ণ হয়। عليهم –তাদের উপর। اَلْمَلٰئِكَةُ–ফেরেশতামন্ডলী। اَلَّا تَخَافُوْا –তোমরা ভয় পেওনা। ولا تحزنو –এবং চিন্তা করিও না। اَبْشِرُوْا –তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। بِالْجَنَّةِ – জান্নাতের। اَلَّتِىْ –যার। كُنْتُمْ –তোমাদের নিকট। تُوْعَدُوْنَ–ওয়াদা করা হয়েছে। نحن –আমরা। اَوْلِيٰؤُكُمْ –তোমাদের বন্ধু। فِىْ–মধ্যে। اَلْحَيٰوةِ الدُّنْيَا –দুনিয়ার জীবন। و –এবং। اٰخِرَةِ–পরকালের। لَكُمْ –তোমাদের জন্য। فِيْهَا–উহাতে রয়েছে। مَا تَشْتَهِىْ–যা কিছু চাও। اَنْفُسُكُمْ –তোমাদের জীবন। مَا تَدَّعُوْ –যার ইচ্ছা তোমরা করবে। نُزُلًا – আপ্যায়ন সামগ্রী। مِنْ–হতে। غَفُوْرٌ–ক্ষমাশীল। رَحِيْمٌ–দয়ালু।

www.pathagar.com

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/প্রোগ্রামে উপস্থিত ইসলাম প্রিয়/ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্সালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সামনে আল-কুরআনের বিশিষ্ট সূরা হা-মীম আস সাজদাহ এর ৩০–৩৫ আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত ও সরল তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে কুরআনের এই দারস সঠিকভাবে পেশ করার তাওফীক দান করেন। "অমা তাওফীকি ইল্লাবিল্লাহ্।"

সূরার নামকরণ ঃ এই সুরাটির নাম দুটি শব্দে গঠিত। একটি হলো 'হা-মীম' আর অপরটি হলো 'সিজদাহ'। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যার শুরু হয়েছে হা-মীম' শব্দ দ্বারা এবং যাতে একটি সিজদাহর আয়াত রয়েছে। তবে এটিও অন্যান্য সূরার ন্যায় 'প্রতীকী' বা 'চিহ্ন' হিসেবে করা হয়েছে। কোন 'শিরোনাম' হিসেবে নামকরণ করা হয়নি।

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ সূরাটি মাক্কী। নির্ভরযোগ্য বর্ণনার ভিত্তিতে বলা যায়, এর নাযিল হওয়ার সময়টা হলো হযরত আমীর হামযা (রাঃ) এর ঈমান আনার পর এবং হযরত উমর (রাঃ) এর ঈমান আনার পূর্বে। এতে ধরে নেয়া যায় এটি মাক্কী জীবনে নবুয়াতের ৪/৫ সনে অবতীর্ণ হতে পারে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ঃ সূরাটির আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো- মক্কার কাফের সরদারদের বিশেষ করে রাসূলের কাছে তাঁর দাওয়াতী কাজ এবং মিশন থেকে সরিয়ে রাখার জন্য কাফের সর্দার উৎবার কতিপয় বৈষয়িক প্রস্তাব, যেমন– ধন-সম্পদ, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও রোগ চিকিৎসার প্রস্তাবের সমুচিত প্রতিউত্তর। কেননা, কাফেরেরা মনে করতো যে, মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবী হওয়া এবং কুরআনের এই ওহীর কথা প্রকৃতপক্ষে সঠিক কোন বিষয় নয়। বরং এর মূলে হলো, ধন-মালের লোভ, রাষ্ট্র ক্ষমতা ও শাসন ক্ষমতা লাভই মূখ্য।

এই সূরায় উৎবার কথাগুলোর প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করেই মক্কার কাফেরদের মূল বিরোধীতাকেই আলোচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কেননা, কাফেরেরা তখন কুরআন মজীদের দাওয়াতকে রুদ্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য অত্যন্ত হঠকারীতা ও অনৈতিকতার সাথে চেষ্টা করতে ছিলো। তারা নবী করীম (সাঃ) কে বলতেছিলো, তুমি যাই করো না কেন, আমরা তোমার কোন কথা-ই শুনবো না। আমরা আমাদের দেলের উপর গেলাফ ফেলে রেখেছি, আমাদের ও তোমার মাঝে একটা প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে, যা তোমাকে ও আমাদেরকে কখনই একত্রিত হতে দেবে না। তারা নবী করীম (সাঃ) কে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলো যে, তুমি তোমার এই দাওয়াতী কাজ

www.pathagar.com

চালিয়ে যাও, আর আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী তোমার বিরোধীতা করে যাবো- করতেই থাকবো।

আলোচ্য আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু ঃ যারা আল্লাহ্ তাআলাকে একমাত্র রব বা পালনকর্তা হিসেবে মেনে নেয় এবং তার উপরই অটল অবিচল থাকে তাদের জন্য নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নতের সুসংবাদ। আয়াতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে মুসলিম দাবীদারদের সর্বউত্তম কথা হলো আল্লাহ্র দিকে মানুষকে দাওয়াত দান করা। আর দাওয়াত দানকারী ধৈর্যশীলদের একটা মহা গুণ হলো চরম শত্রুর কটু কথাকেও অতি উত্তম কথা ও আচারণ দিয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ে নেয়া। আর এই মর্যাদা কেবল সৌভাগ্যবানদেরই কপালে জোটে।

ব্যাখ্যা ঃ দারসে কুরআন প্রোগ্রামে উপস্থিত প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে দারসের জন্য কতিপয় প্রাথমিক ধারণা প্রদান করলাম। এখন আমি আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি। মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর উপর অটল বিশ্বাসীদের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ–

নিশ্চয় যারা বলে, আল্লাহ্ই আমাদের রব-পালনকর্তা। অতঃপর একথার উপরই অটল-অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে বলে, তোমরা ভয় পেও না, চিন্তাও করো না। আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও, যার ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হয়েছিলো।

ইতিপূর্বে কাফেরদেরকে তাদের হঠকারিতা ও সত্য বিরোধীতার পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। এখন এই আয়াত থেকে ঈমানদার লোক এবং নবী করীম (সাঃ) কে লক্ষ্য করে কথা বলা শুরু হয়েছে। আয়াতের প্রথমাংশে বলা হয়েছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا–

নিশ্চয় যারা বলে আল্লাহ্ই আমাদের রব, অতঃপর এই কথার উপরই অটল-অবিচল থাকে। এখানে দু'টি কথা বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

এক. قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ তারা বলে আল্লাহ্ আমাদের রব। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্কে পালনকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করে এবং তা স্বীকারও করে, এটা হলো মূল ঈমান।

দুই. ثُم اسْتَقَامُوْا অতঃপর তাতে অবিচলও থাকে। এটা হলো সৎকর্ম। এক কথায় তারা এভাবে 'ঈমান' ও 'সৎকর্ম' উভয় গুণে গুনান্বিত হয়ে যায়।

اِسْتَقَامَتْ শব্দের অর্থ– ঈমান ও তাওহীদে কায়েম থাকা, তা পরিত্যাগ না করা।' অর্থাৎ কোন এক সময় আকস্মিক ও সাময়িক ভাবে আল্লাহ্কে নিজেদের রব বলেই তারা ক্ষান্ত হয় না এবং এমন ভ্রান্ত নীতিও তারা গ্রহণ করে না যে, একদিকে আল্লাহ্কে নিজেদের রবও বলবে, আর সংগে সংগে অপরাপর শক্তিকেও খোদা হিসেবে মান্য করতে থাকবে। বরং তারা একবার এই আকীদা গ্রহণ করার পর সারা জীবন তার উপরই অটল-অবিচল থাকে। এর বিপরীত কোন আকীদাই তারা গ্রহণ করেনা, এর সাথে কোন বাতিল আকীদার সংমিশ্রণও ঘটাই না এবং তারা কর্মজীবনেও তাওহীদের এই আকীদারই বাস্তব অনুসরণ করে চলে।

তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদে অটল-অবিচল হয়ে থাকার প্রকৃত তাৎপর্য মহানবী (সাঃ) নিজে এবং বড় বড় সাহাবাগণও এর ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) এর বর্ণনায় পাওয়া যায়- মহানবী (সাঃ) اِسْتَقَامَةْ বা 'অটল-অবিচল' থাকার ব্যাপারে বলেছেন–

قد قالها الناس ثم كفر اكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام–

অনেক লোকই আল্লাহ্কে নিজের রব বা প্রতিপালক বলে মেনে নিয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই কাফের হয়ে গেছে। কেবল দৃঢ়ভাবে তারাই দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে, যারা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই আকীদার উপর অটল হয়ে থাকতে পেরেছে। (ইবনে জরীর, নাসায়ী, ইবনে আবু হাশেম)। প্রথম খলিফা এবং নবী করীম (সাঃ) এর বিশ্বস্ত সহচর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) اِسْتَقَامَةْ এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

www.pathagar.com

لَمْ يُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا لَمْ يَلْتَفِتُوْا اِلٰى اِلٰهٌ غَيْرَهٗ

(আল্লাহ্‌র একত্ববাদে ঈমান আনার পর তারা) আল্লাহ্‌র সাথে কাকেও শরীকও বানায় না এবং তিনি ছাড়া অপর কোন মাবুদের দিকে ফিরেও তাকায় না। (তাফসীরে ইবনে জরীর)

একবার হযরত উমরে ফারুক (রাঃ) মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে اِسْتَقَامَتْ এর এই আয়াত পাঠ করলেন এবং বললেন ঃ 'আল্লাহ্‌র কসম! 'ইসতিকামাত' বা দৃঢ়তা অবলম্বনকারী হলো সেই লোক, যারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উপর অটল-অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং খেক শিয়ালের মতো এদিক থেকে ওদিক পালানোর পথ বের করার জন্য দৌড়া-দৌড়ি করে না'। (তাফসীরে ইবনে জরীর)

اِسْتَقَامَتْ'-এর ব্যাখ্যায় হযরত উসমান (রাঃ) বলেন ঃ নিজের আমল আল্লাহ্‌র জন্য খালেস করলো। (তাফসীরে কাশ্‌শাফ)। অনুরূপভাবে اِسْتَقَامَتْ-এর ব্যাখ্যায় হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ 'যে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ফরয সমূহ পূর্ণ আনুগত্যের সাথে আদায় করে।' (তাফসীরে কাশশাফ)।

اِسْتَقَامَتْ এর উপরোক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে যা পাওয়া যায় তা হলো, খালেশ দিলে আল্লাহ্‌কে নিজের রব হিসেবে মেনে নেওয়া এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় পোষণ না করা। তার দেওয়া শরীয়তের যাবতীয় বিধিবিধান মেনে চলা, হালাল জিনিস গ্রহণ করা এবং যাবতীয় হারাম থেকে বেঁচে থাকা।

তাফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে ঃ رَبُّنَا اللّٰهُ 'আল্লাহ্ আমাদের রব বা পালনকর্তা'– একথাটি বলা তখনই শুদ্ধ হতে পারে, যখন অন্তরে বিশ্বাস করা হয় যে, আমি প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক পদক্ষেপেই আল্লাহ্ তাআলার প্রশিক্ষণাধীন। তাঁর রহমত ছাড়া আমি একটি শ্বাসও ছাড়তে পারি না। এর দাবী এই যে, মানুষ আল্লাহ্‌র এবাদতে অটল-অবিচল থাকবে এবং তার আত্মা ও দেহ চুল পরিমাণও আল্লাহ্‌র দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ সাকাফী (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর

www.pathagar.com

কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী, আমাকে এমন এক পূর্ণাঙ্গ বিষয় বলে দিন যা শোনার পর আর কারও কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ 'বলো, আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলাম অতঃপর তাতে অবিচল থাকলাম'। (মুসলিম শরীফ)। এই কথাটির বাহ্যিক অর্থ এই যে, ঈমান ও তার দাবী অনুযায়ী সৎ কর্মের প্রতিও অবিচল থাকা।

যারা আল্লাহ্‌কে রব বলে স্বীকার করে এবং তার উপরই অটল-অবিচল থাকে তাদের প্রতিদান হিসেবে আয়াতের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ–

(এই গুণের জন্য) তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে বলে, তোমরা ভয় পেও না, চিন্তাও করো না। আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাও যার ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হয়েছে।

যারা আল্লাহ্‌কে নিজের রব বলে মনে-প্রাণে মেনে নেয় এবং তার উপরই অটল-অবিচল থাকে তাদের প্রতিদান হিসেবে তাদের কাছে 'ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়' একথাটির ব্যাখ্যায় মুফাসসেরীনগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

(i) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উক্তি অনুযায়ী ফেরশতাগণের এই অবতরণ ও সম্বোধন মৃত্যুর সময় হবে।

(ii) কাতাদাহ বলেন হাশরের দিন কবর থেকে বের হবার সময় ফেরেশতা নাযিল হবে।

(iii) নেকী ইবনে জাররাহ বলেন ঃ ফেরেশতাদের অবতরণ তিন সময় হবে, প্রথম হবে মৃত্যুর সময়, দ্বিতীয়বার হবে কবরের ভিতর এবং তৃতীয়বার হবে হাশরের দিন কবর থেকে উঠার সময়।

(iv) বাহরে মুহীতে আবু হাইয়্যান বলেন ঃ আমি তো বলি, মুমিনদের কাছে ফেরেশতাদের অবতরণ সবসময় হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া ও বরকত তাদের কাজ-কামে পাওয়া যায়। তবে চাক্ষুষ দেখা ও শোনা উপরোক্ত সময়েই হবে।

(v) তাফসীরে মাযহারীতে হযরত সাবেত বেনানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সূরা 'হা-মীম সিজদা' তেলাওয়াত করতঃ আলোচ্য আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, আমি হাদীস থেকে জেনেছি যে, মুমিন ব্যক্তি যখন কবর থেকে উঠবে,

www.pathagar.com

তখন দুনিয়াতে যেসব ফেরেশতা তার সাথে থাকতো, তারা এসে বলবে, তুমি ভীত ও চিন্তিত হয়ো না; বরং ওয়াদাকৃত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। তাদের এই কথা শুনে মুমিন ব্যক্তি নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে।

(vi) মাওলানা মওদুদী (রহঃ) তাঁর তাফহীমুল কুরআনে উল্লেখ করেন, ফেরেশতা নাযিল হওয়ার এই ব্যাপারটি বাহ্যিক অনুভূতিযোগ্য রূপে হবে এবং ঈমানদার লোকেরা তাদেরকে নিজেদের চোখে দেখতে পাবে কিংবা তাদের আওয়াজ কানে শুনবে এমন ভাবে হওয়াটা জরুরী নয়। যদিও আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে কারো জন্য ফেরেশতাদেরকে পাঠাতেও পারেন- পাঠিয়েও দেন; কিন্তু সাধারণ ভাবে মুমিন ব্যক্তির প্রতি বিশেষ করে কঠিন সময়ে যখন তারা সত্যের দুষমনদের হাতে নির্মমভাবে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হতে থাকে, তখন ফেরেশতাদের আগমন হয়ে থাকে অপ্রকাশ্য ভাবে এবং তাদের কথা কানের পর্দায় ধ্বনিত হওয়ার পরিবর্তে দেলের গভীরে উত্তীর্ণ হয়ে শান্তি ও স্বস্থি অনুভব করতে থাকে। যেসব মুফাসসীর বলেছেন ফেরেশতা নাযিলের এই ঘটনা ঘটবে মৃত্যুর সময় কিংবা কবরের ভিতর অথবা হাশরের ময়দানে। আসলে কোন্ অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতিতে এই আয়াত নাযিল হয়েছিলো তা বিবেচনা করলে এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ থাকে না যে, এই ব্যাপারটি এখানে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো এই জীবনে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টাকারীদের উপর ফেরেশতা নাযিল হওয়ার কথা বলা, যেন তারা শান্তি ও স্বস্থি লাভ করতে পারে, তাদের মনে সাহস হিম্মত জাগে, তাদের মনে যেন এই অনুভূতি জাগে যে, তারা অসহায় নিরাশ্রয় নয়, আল্লাহ্র ফেরেশতা তাদের সাথে রয়েছে। যদিও আল্লাহ্র ফেরেশতা মৃত্যুর সময়ও মুমিন ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আসে এবং কবরেও তাদেরকে সম্মান জানায়। আর কিয়ামতের দিনও হাশরের শুরু হতে জান্নাতে পৌঁছা পর্যন্ত তারা সব সময় তাদের সংগে লেগেই থাকে। তবে ফেরেশতাদের এই সংগী হওয়াটা কেবল মাত্র সেই জগতের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং এই দুনিয়াতেও তা যথারীতি হয়ে থাকে।

প্রিয় ভায়েরা/ বোনেরা! আয়াতের বর্ণনার ধারাবাহিকতা হতে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে, শয়তান ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে ও সংগ্রামে যেমন ভাবে বাতিল পন্থীদের সংগে থাকে, তেমনিভাবে হক পন্থী মুমিন লোকদের সংগী হয়ে থাকে আল্লাহ্র ফেরেশতারা।

বাতিল পন্থীদেরকে তাদের সংগী শয়তান এবং দুষ্ট লোকেরা যেমন ভাবে দ্বীনের

www.pathagar.com

ব্যাপারে যুলুম নির্যাতন সফলতা লাভের একমাত্র পথ হিসেবে গণ্য করায় এবং তাদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতে থাকে। তেমনি ভাবে সত্যপন্থী মুমিন লোকদের নিকট ফেরেশতা আগমন করে সেই নির্ভয় ও সুসংবাদই দিতে থাকে যা পরবর্তী বাক্যে উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ-نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ- نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ-

(তারা বলেঃ) তোমরা ভয় পেও না, চিন্তাও করো না। আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাও যার ওয়াদা তোমাদের নিকট করা হয়েছিলো! আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের সংগী-সাথী, আর পরকালেও। সেখানে তোমরা যা কিছু চাও, তোমরা তা পাবে। আর যে যে জিনিসের তোমরা ইচ্ছা করবে, তাও তোমরা পাবে। এ সবই হলো মেহমানদারীর সামগ্রী সেই মহান আল্লাহ্‌র তরফ হতে যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

এই দু'টি আয়াতে সত্য পন্থী মুমিন ব্যক্তিদের জন্য কয়েকটি নির্ভয়ের বাণী ও সুসংবাদ জানানো হয়েছে। মুমিন ব্যক্তির কাছে ফেরেশতা নাযিল হয়ে বলবে–

এক. اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا **তোমরা ভয় পেও না, চিন্তিত হয়ো না।** অর্থাৎ তোমরা যারা মক্কার কাফেরদের দ্বারা নির্যাতিত নিষ্পেষিত হচ্ছো এতে তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ো না এবং ঈমানের উপর টিকে থাকতে পারবে কিনা এবং তোমাদের বংশধরদের অবস্থা কি হবে এজন্য চিন্তাগ্রস্তও হয়ে পড়ো না। কেননা, তোমাদের সাথে আল্লাহ্ ও তার ফেরশেতারা রয়েছে। তোমাদের নির্ভয় দেওয়ার জন্য এবং তোমাদের মনোবল বৃদ্ধি ও তোমাদের বংশধরদের জন্য আমরা সদা-সর্বদা নিয়োজিত রয়েছি।

দুই. وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ- "**আর তোমরা সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাও, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।**

www.pathagar.com

সত্যপন্থী মুমিনদের জন্য দ্বিতীয় যেই সুসংবাদ তা হলো নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত। নির্যাতিত মুমিনদের কঠোর নির্যাতন, ত্যাগ ও কোরবানীর জন্য যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান রয়েছে ফেরেশতারা তার খোশখবর দিয়ে বলছেন, হে মুমিনেরা, তোমরা তোমাদের ঈমানের উপর টিকে থেকে তোমাদের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য তোমরা জান-মাল দিয়ে যে সংগ্রাম করছো এর বিনিময় তো তোমাদের আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে, যার ওয়াদা তিনি করেছেন, আর তা হলো জান্নাত। যারা জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রাম করে তাদের পাওনা তো জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ্ তো এদের জান-মালকে জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। সূরা তওবায় মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের জান-মালকে জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। (তাওবা-১১১)

তিন. نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ

আমরা (ফেরেশতারা) এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের সংগী-সাথী এবং পরকালের জীবনেও।

সত্যপন্থী মুমিন ব্যক্তিদের জন্য তৃতীয় যে সুসংবাদ তা হলো উভয় জগতে ফেরেশতারা সংগী-সাথী। উভয় জগতেই তারা সাহায্যকারী। এটা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। দুনিয়া হতে পরকাল পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে ফেরেশতারা মুমিন ব্যক্তিদের জন্য অভিভাবক।

এই দুনিয়ায় তোমাদের সংগী-সাথী ফেরেশতাদের এই কথার তাৎপর্য হলো, এই যে, বাতিলের শক্তি ও দাপট যতো বড় এবং যতো সাংঘাতিকই হোক না কেন, যতই অত্যাচারী ও নিপীড়ক হোক না কেন, তার জন্য বিন্দুমাত্র ভীত ও সন্ত্রস্ত হবার প্রয়োজন নেই। সত্যনীতি মেনে চলার জন্য তোমাদেরকে যে দুঃখ-কষ্ট ও বঞ্চনা বরদাশত করতে হয়, সেজন্য তোমরা মনে কোন প্রকার দুঃখ বা অনুতাপ রেখ না। কেননা, ভবিষ্যতে তোমাদের জন্যে যা কিছু আছে তা দুনিয়ার যে কোন নিয়ামত এর তুলনায় অনেক বেশী উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ। যখন ফেরেশতারা ঠিক মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তিদের একথাটি অর্থাৎ "আমরা তোমাদের সংগী-সাথী" বলেন, তখন এর তাৎপর্য হলো এই যে, এখন তোমরা

www.pathagar.com

যে মনযিলের দিকে যাচ্ছো, সেখানে তোমাদের চিন্তার কোনই কারণ নেই। কেননা, সেখানে জান্নাত তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আর দুনিয়ায় যাদেরকে রেখে যাচ্ছো তাদের জন্যও চিন্তিত হবার কোনই কারণ নেই। কেননা, এখানেও আমরা তাদের জন্য বন্ধু ও সাহায্যকারী।

'কবর' তথা 'বরযখের' জগতে ও হাশরের ময়দানে ফেরেশতা যখন এই কথা অর্থাৎ আমরা তোমাদের সাথী বলবেন, তখন এর অর্থ হবে, এখানে তোমাদের পরম নিশ্চিন্ততা। ভাবনা-চিন্তার কোনই কারণ নেই। দুনিয়ার জীবনে তোমাদের যা কিছু ঘটবে সেই জন্য বিন্দুমাত্র ভয় পেও না। কেননা, আমরা তোমাদেরকে সেই নিয়ামতে ভরা জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার ওয়াদা আল্লাহ্ তাআলা বার বার তোমাদের কাছে করেছেন।

চার. وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ তোমরা সেখানে (জান্নাতে) যা কিছু চাবে, তাই পাবে। আর যে যে জিনিসের ইচ্ছা তোমরা করবে তাই তোমাদের হবে।

সত্যনিষ্ঠ দল মুমিন ব্যক্তিদের জন্য ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সুসংবাদের আরো একটি বিষয় হলো এই যে, তোমরা তো জান্নাত পাবেই কিন্তু জান্নাতে যেয়ে তোমরা কোন কিছু থেকে অভাব অনুভব করবে না। তোমরা কোন কিছু থেকে বঞ্চিত হবে না। তোমরা যখন যা চাইবে তৎক্ষণাত তাই পাবে, এমনকি তোমাদের মনের মধ্যে যা ইচ্ছা করবে তাই পেয়ে যাবে। মোট কথা তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ করা হবে– তোমরা চাও বা না চাও।

পাঁচ. نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ এটা হলো ক্ষমাশীল দয়ালু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মেহমানদারীর সামগ্রী।

নির্যাতিত মুমিন ব্যক্তিদের জন্য ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে পয়গামের পঞ্চম যে প্রতিদান তা হলো– ক্ষমাশীল, দয়ালু দাতা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মেহমানদারী। এটা যে কত বড় পাওয়া এবং কত বড় নিয়ামত তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দুনিয়া এবং পরকালের জীবনে এর চেয়ে বড় পাওনা আর হতে পারে না। এর চেয়ে বড় মেহমানদারী আর কোন মেহমানদারী হতে পারে না।

نُزُلٌ তথা 'আপ্যায়ন' বা 'মেহমানদারীর' কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নিয়ামতও পাবে, যার আকাংখাও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না।

www.pathagar.com

যেমন, মেহমানের সামনে এমন অনেক আইটেমও আসে যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষ করে যখন কোন বড় লোকের ঘরে মেহমানদারী হয়। (তাফসীরে মাযহারী)

মেহমানদারী সম্পর্কে হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, জান্নাতে কোন পাখী উড়তে দেখে তোমাদের মনে তার গোশত খাবার বাসনা সৃষ্টি হবে। আর অমনি তা ভাজা করা অবস্থায় তোমাদের সামনে এসে যাবে। কতক বর্ণনায় আছে, তাকে আগুন ও ধোঁয়া কিছুই স্পর্শ করবে না। আপনা-আপনি রান্না হয়ে সামনে এসে যাবে। (তাফসীরে মাযহারী)

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেন, যদি জান্নাতি ব্যক্তি নিজ ঘরে সন্তান জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব, শিশুর দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পণ সব এক মুহূর্তের মধ্যেই হয়ে যাবে। (তাফসীরে মাযহারী)

অর্থাৎ জান্নাতি মুমিন ব্যক্তির জন্য আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাশ, খানা-পিনা, আনন্দ-ফুর্তি সবকিছুই জান্নাতে মওজুদ রয়েছে। যেভাবে দুনিয়ায় কোন ভি. ভি.আই পি-র জন্য মওজুদ থাকে। তার থেকেও অনেক অনেক গুণ বেশী মওজুদ রয়েছে যা আমরা দুনিয়ার জীবনে চিন্তাও করতে পারি না।

ঈমানদার লোকদেরকে শান্তনা দান এবং তাদের সাহস বৃদ্ধির পর তাদেরকে তাদের আসল দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ–

আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অতি উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকে, নিজে সৎ কাজ করে এবং বলে আমি একজন মুসলমান? মুমিন লোকদেরকে শান্তনা প্রদান ও তাদের সাহস-হিম্মত বৃদ্ধির পর এখন তাদেরকে তাদের আসল দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ এবং উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

পূর্বের আয়াতে তাদেরকে বলা হয়েছিলো যে, আল্লাহ্কে রব মেনে নিয়ে তাঁর ইবাদত-বন্দেগীর উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং এই পথ গ্রহণের পর তা থেকে বিভ্রান্ত না হওয়াটা এমন এক নেক এবং মহৎ কাজ যা মানুষকে ফেরেশতাদের বন্ধু ও জান্নাত পাবার অধিকারী বানিয়ে দেয়। এখন এই আয়াতে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা নিজেরা সৎ কাজ করবে এবং অন্য লোকদেরকেও আল্লাহ্র দাসত্ব করার জন্য দাওয়াত দেবে। আর এই দাওয়াতী কথা ও কাজ

www.pathagar.com

এমন এক অতি উচ্চ ও উন্নত কথা এবং কাজ যা পৃথিবীতে অপর কোন কথা ও কাজ হতে পারে না। তাছাড়া এই আয়াতে মুমিনদেরকে আরও বলা হয়েছে যে, তোমরা শুধু নিজেরা নেক কাজ এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র দাসত্বের দিকে দাওয়াত দিয়েই ক্ষান্ত হবে না বরং মক্কার এই কঠিন পরিবেশও যেখানে মুসলমানিত্বটুকু প্রকাশ করার পরিবেশ নেই, এমন প্রতিকুল পরিবেশও ঈমানের দাবী অনুযায়ী বাতিল শক্তির সামনে বুক ফুলে ঘোষণা করে দাও যে, 'আমি একজন মুসলমান'।

আল্লাহ্ পাকের এই কথার গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য যে পরিবেশে এই কথাগুলো বলা হয়েছে তা চোখের সামনে রাখলে সহজেই অনুধাবন করা যাবে। তখন মক্কার অবস্থা ছিলো এই যে, যে ব্যক্তিই মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করতো, সে সহসাই মনে করতো, যেন সে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের জংগলে পা দিয়েছে, যেখানে প্রত্যেকেই তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে খেয়ে ফেলার জন্য ধেয়ে আসছে। এর পরও যে লোক সেখানে ইসলাম প্রচারের জন্য মুখ খুলতো, সেতো যেন হিংস্র জানোয়ারগুলোকে এই বলে দাওয়াত দিতো, আসো তোমরা আমাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে খেয়ে ফেল। এই ছিলো তৎকালীন আরব ভূমি মক্কার অবস্থা। এই অবস্থাই বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌কে নিজের রব মেনে নিয়ে তার উপর অবিচল থাকা এবং তা থেকে হটে না যাওয়াটা নিঃসন্দেহে অতি বড় নেকীর কাজ– মৌলিক নেকীর কাজও বটে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী এবং পূর্ণ মাত্রার নেকীর কাজ হলো এই যে, সেই ব্যক্তি মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে বলবে, 'আমি একজন মুসলমান'। আর পরিনামের চিন্তা না করে দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহ্‌র দাসত্বের দিকে দাওয়াত দেবে এবং এই কাজ করতে করতে নিজের আমলকে এতখানি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে রাখবে যে, ইসলাম ও তার প্রতিষ্ঠাকারী মুমিন লোকদের কোন দোষ বের করা সম্ভব হবে না।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে এই কঠিন পরিবেশও তাদেরকে আরও উদাহরতা প্রদানের কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ –

ভালো ও মন্দ সমান নয়। তোমরা অন্যায় ও মন্দকে দূর করো সেই ভালো দিয়ে যা অতি উত্তম।

এই আয়াতাংশে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দানকারীদের বিশেষ পথনির্দেশ দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছে। অর্থাৎ তারা মন্দের জবাব ভালো দ্বারা দেবে।

এই কথাটির পূর্ণ তাৎপর্য ও ভাবধারা বুঝবার জন্য ঠিক যেরূপ অবস্থায় নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদেহকে এই উপদেশ দেয়া হচ্ছিল তা চোখের সামনে রাখা দরকার। তখন অবস্থা এই ছিল যে, সত্য দ্বীন ইসলামের দাওয়াতের বিরোধীতা করা হচ্ছিল চরম হঠকারীতা ও শক্ত, কঠিন-নির্মম আক্রমনাত্মক ভূমিকা দ্বারা। তাতে মানুষের নীতি-নৈতিকতা মানবতা-মনুষ্যত্ববোধ ও ভদ্রতা এবং সৌজন্যতার সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর সংগী-সাথীদের বিরুদ্ধে যতো প্রকারের মিথ্যা হোক তারা বলতো। তাঁর বদনাম করা এবং লোকদেরকে তাঁর সম্পর্কে খারাপ ধারণা দেওয়ার যতো প্রকারের হাতিয়ার ছিলো তারা তা ব্যবহার করতো। তাঁর উপর নানা ধরনের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ একের পর এক উত্থাপন করা হতো। তাঁকে এবং তাঁর সংগী-সাথীদেরকে নানা ভাবে যুলুম-নিপীড়ন করা হতো, জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়া হতো। এতে অতিষ্ঠ হয়ে বেশকিছু মুসলমান মক্কা ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। রাসূলের দ্বীনের প্রচারের কাজে বাধা দেওয়ার জন্য এমনই এক কর্মসূচী নেয়া হয়েছিলো যে, তার জন্য একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবককে নিয়োগ করা হয়েছিলো। যখনই নবী করীম (সাঃ) মানুষের কাছে দাওয়াতী কথা বলতেন তখনই তারা এমন হট্টগোল ও চিৎকার করতো যে, তাঁর কোন কথাই শোনা যেত না। আসলে এটা ছিল খুবই মন খারাপকারী অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে দ্বীন প্রচারের সকল পথই বন্ধ মনে হচ্ছিল। ঠিক এরূপ কঠিন অবস্থা ও পরিবেশে তাদের এ ধরনের বিরুদ্ধতার দাঁত চূর্ণ-বিচূর্ণ করার উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম (সাঃ) ও তাঁর সংগী-সাথী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে দুটি কথা বলা হয়েছে।

প্রথম কথা হলো ঃ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

ভালো ও মন্দ সমান নয়। অর্থাৎ নেকী ও পাপ, ভালো ও মন্দ কখনো একরূপ নহে, সমান হতে পারে না। অর্থাৎ দ্বীনের দাওয়াতের বিরোধীতাকারী কাফের মুশরিকরা অন্যায় ও পাপের যতো বড় তুফানেরই সৃষ্টি করুক না কেন, তার থেকে মোকাবেলায় নেকী ও পূণ্য যতই দুর্বল অসহায় ও অক্ষমই মনে হোক না কেন; আসলে কিন্তু পাপ ও বদ কাজ নিজে খুবই দুর্বল। আর এই জন্যই শেষ পর্যন্ত মন্দ ও খারাপ নেকী ও ভালোর কাছে পরাভূত হবেই। কেননা, মানুষ যতদিন মানুষ, তার প্রকৃতি পাপ ও অন্যায়কে ঘৃণা না করে পারে না। যারা

www.pathagar.com

পাপ এবং অন্যায় করে শুধু তারাই নয় বরং তাদের নেতারাও পর্যন্ত মনে মনে এই কথা অনুভব করে যে, তারা আসলে নিজেরা মিথ্যুক। যুলুম ও নির্যাতন তারা করছে, তারা তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই করছে। এজন্য তারা নিজেদেরকে অপরাধী মনে করে এবং অন্যরাও যে তাদের সম্মান করে না তাও তারা অনুভব করে। তারা নিজেদেরকে চোর চোর ভাবে। কেননা, আল্লাহ্ পাক মানুষকে বিবেক নামের একটি অনুভূতি ক্ষমতা দান করেছেন।

সুতরাং এই পাপ ও অন্যায়ের মোকাবেলায় যদি নেকী ও ভালো একেবারে অসহায়, অক্ষম, দুর্বল মনে হয়, তা যদি ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করতে থাকে, তা হলে শেষ পর্যন্ত তা জয়ী হবেই। কেননা, নেকীর মধ্যে এমন এক শক্তি নিহিত থাকে যে তা কঠিন দেলকেও প্রভাবিত করে দখল করতে পারে। মানুষ যতই খারাপ হোক না কেন, তার দেলে নেকীর মূল্য ও মর্যাদা অনুভব না করে কিছুতেই পারে না। আর নেকী ও ভালো এবং মন্দ ও খারাপ যখন পরস্পরের সামনা-সামনি হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং উভয়ই পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে, তখন এরূপ অবস্থায় দীর্ঘ সময় দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের পর এমন লোক খুব কমই বাকী থাকে যারা বদী ও খারাপের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নেকী ও ভালোর জন্য আত্মত্যাগ না করে পারে!

দ্বিতীয় কথা হলো ঃ অতঃপর আল্লাহ্ পাক মুমিনদের জন্য দ্বিতীয় যে কথাটি বলেছেন তা হলো–

اِدْفَعْ بِا لَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ

তোমরা অন্যায় ও মন্দকে দূর করো সেই ভালো দ্বারা যা অতি উত্তম। এখানে বলা হয়েছে বদী বা অন্যায়ের মোকাবেলা কেবল নেকী বা ভালো দ্বারা করলে চলবে না। করতে হবে এমন নেকী ও ভালো দ্বারা যা অতি উত্তম এবং উচ্চমানের। অর্থাৎ কেউ তোমাদের সাথে অন্যায় করলে তোমরা যদি তা মাফ করে দাও, তা হলে এটা শুধু নেক কাজ হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু অতি উচ্চমানের নেকী হলো এই যে, তোমাদের সাথে যে খারাপ কথা বলবে, তুমি তাকে ভালো কথায় জবাব দেবে। কেউ খারাপ ব্যবহার করলে, সুযোগ পেলে তুমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। (তাফহীমুল কুরআন)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের নির্দেশের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি রাগ দেখায়, তার মোকাবেলায় তুমি সবর করো, যে তোমার প্রতি মূর্খতা প্রকাশ করে, তুমি তার প্রতি সহনশীলতা দেখাও এবং যে তোমাকে

www.pathagar.com

জ্বালাতন করে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। (মাযহারী)

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, এই আয়াতের শিক্ষা হলো এই যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে জনৈক ব্যক্তি গালি দিল অথবা মন্দ বললো। তিনি জবাবে বললেন যদি তুমি সত্যবাদী হও এবং আমি অপরাধী ও মন্দ হই, তা হলে যেন আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করেন। আর যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তবে আল্লাহ্ যেন তোমাকে ক্ষমা করেন। (কুরতুবী)

দাওয়াত দানকারীর করণীয় সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ পাক অন্য জায়গায় বলেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِا لْحِكْمَةِ وَالْمَوْ عِظَةِ الْحَسَنَةِ

(হে রাসূল,) তুমি তোমার রবের দিকে মানুষকে দাওয়াত দাও হিকমত তথা বুদ্ধিমতার সাথে অতি উত্তম কথার দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো অতি উত্তম ভাবে। (সূরা নহল–১২৫)

এই আয়াতে আল্লাহ্ পাক দাওয়াত দানকারীকে তিনটি করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। **এক.** দাওয়াত দিতে হবে বুদ্ধিমত্তার সাথে যা গ্রহণযোগ্য হয়। **দুই.** দাওয়াত দিতে হবে অতি উত্তম কথার দ্বারা। **তিন.** দাওয়াতী কাজে যদি বিরোধীদের সাথে বিতর্ক হয় তবে অতি উত্তম ভাষায় বিতর্ক করতে হবে, যাতে তারা এক পর্যায়ে স্যালেন্ডার করে।

মন্দ ও খারাপের উত্তর যদি ভালো ও অতি উত্তম কথার দ্বারা দেওয়া হয়, তা হলে তার পরিণতিতে কি হবে, এই কথা বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ আয়াতের পরবর্তী অংশে বলেন ঃ

فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ–

তাহলে তোমরা দেখবে যে, তোমাদের সাথে যাদের শত্রুতা ছিলো তারা তোমাদের প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে।

মন্দের জবাব অতি উত্তম দ্বারা দিলে তার পরিনাম কি হবে, সেই সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যে, নিকৃষ্টতম দুশমনও শেষ পর্যন্ত প্রাণের বন্ধু হয়ে যাবে। কেননা, এরূপ হওয়াই মানুষের স্বভাব, এটাই মানুষের প্রকৃতি।

গালাগালির জবাবে যদি কেউ চুপ করে থাকে, তবে এটা যে নেকীর কাজ এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গালাগালির মুখ তাতে বন্ধ হবে না। গালাগালির জবাবে যদি কেউ তার জন্য উল্টো কল্যাণের দোআ করে, তাহলে যত বড়

www.pathagar.com

বেহায়া দুশমনই হোক না কেন সে অবশ্যই লজ্জিত হবে, তার গালাগালির মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। আবার যদি কেউ ক্ষতি করার জন্য চেষ্টা করে, আর যদি কেউ তার এই বাড়াবাড়িকে অহরহ হজম করে যায়, তাহলে সে তার এই অপকর্মের কাজে আরো সাহসী হবে। কিন্তু যদি কেউ কোন সময় দুশমনের ক্ষতি হতে দেখে এবং আগে বেড়ে তার সেই ক্ষতি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, তাহলে সে এক সময় দেখা যাবে তার বাড়াবাড়ি তো দূরের কথা সে তার পায়ের উপর এসে পড়ে যাবে। সে বসে এসে যাবে। কেননা, এই উদার ভালো আচারণের মোকাবেলায় কোন খারাবিই টিকে থাকতে পারে না। তার পরেও এটা সাধারণ ও স্থায়ী নিয়ম নাও হতে পারে। এরূপ উচ্চমানের নেকী ও ভালো আচরণ দ্বারা সব দুশমনই যে প্রাণের বন্ধু হয়ে যাবে এমন কথা বলা যায় না। দুনিয়ায় এমন অনেক খবিস আত্মার লোকও আছে, যাদের বাড়াবাড়ি, অত্যাচার-নিপীড়ন ক্ষমা করে এবং তাদের ক্ষতির জবাবে দোয়া ও কল্যাণ করার জন্য যতো প্রকারের উদারতা ও আন্তরিকতা দেখানো হোক না কেন তাদের সেই দুষমনির ছোবল বন্ধ হয় না। যেমন বন্ধ হয়নি আবু জেহেল, আবু লাহাব, উৎবা এবং উতাইবাদের। আল্লাহ্ পাক এ ধরনের অন্তরকে পাথরের চেয়েও কঠিন বলে উল্লেখ করে অন্য আয়াতে বলেন ঃ

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ
اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ۭ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ
الْاَنْهٰرُ ۭ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاۗءُ ۭ
وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

(বনি ঈসরাঈলের লোকদেরকে অসংখ্য ঘটনা এবং নিদর্শন দেখানোর পরও যখন তাদের অন্তর আল্লাহ্ মুখী হলো না, তখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেন,) **অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর আরো কঠিন হয়ে গেল। এতো কঠিন যে তা পাথরের মতো অথবা তার চেয়েও কঠিন। পাথরের মধ্যে তো এমনও আছে, যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও পাথর আছে যা ফেটে যায়, অতঃপর তা থেকে পানি বের হয় এবং এমনও (পাথর) আছে, যা আল্লাহ্র ভয়ে খসে খসে পড়তে থাকে। (বাকারা-৭৪)**

আর এই সব খবিশ অন্তরের লোকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ সূরা বাকারার প্রথম দিকে বলেছেন–

www.pathagar.com

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

আল্লাহ্ তাদের অন্তর এবং কানসমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তাদের চোখ সমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (বাকারা-৭) তবে এরূপ পরিপূর্ণ শয়তান মানুষ খুব কম সংখ্যক পাওয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ্ পাক পরবর্তী আয়াতে কারা মন্দের জবাব ভালো দ্বারা দিতে পারে এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ঃ

وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ–

এই গুণ কেবল তাদের মধ্যেই আছে, যারা ধৈর্যশীল। আর এই মর্যাদা কেবল তারাই লাভ করতে পারে যারা বড় ভাগ্যবান।

অত্র আয়াতে দাওয়াত দানকারীর দুটি গুণের কথা বলা হয়েছে। একটি হলো– ধৈর্যশীল এবং অপরটি হলো সৌভাগ্যবান।

দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে যেসব প্রেসক্রিপশান বা ব্যবস্থা পত্রের কথা বলা হয়েছে তা যদিও খুবই কার্যকর। কিন্তু উহার প্রয়োগ কোন হাসি-মাতাশার ও খেলার বস্তু নয়। এর জন্য বড় মনোবল ও বলিষ্ঠ আত্মার প্রয়োজন। উচ্চ মানসিকতা, দৃঢ় সংকল্প, সহ্যশক্তি এবং অতি বড় আত্মসংযমের প্রয়োজন। হয়তোবা সাময়িক ভাবে কেউ কোন অন্যায়ের মোকাবেলায় বড় কোন নেক কাজ করেদিল, এটা কোন অস্বাভাবিক কাজ নয়, যে কেউ এটা করতে পারে। কিন্তু যেখানে একেক জনকে বছরের পর বছর ধরে এমন সব বাতিল পন্থী ও দুস্কৃতিকারীদের মোকাবেলায় সত্য দ্বীনের জন্য অব্যাহত ভাবে লড়াই সংগ্রাম করতে হয়, যারা কোন নীতি নৈতিকতার ধার ধারে না। যারা নীতি লংঘন করতে একটুও দ্বিধা করে না। তাছাড়া বাহুশক্তি ও ক্ষমতার নেশায়ও থাকে মত্ত। সেখানে নেকী-উচ্চমানের নেকীর ব্যবহার করে যাওয়া এবং একবারও সংযম ও সহনশীলতার রশি টুটে না যাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। এই কঠিন কাজ তো সেই আঞ্জাম দিতে পারে, যে ব্যক্তি প্রশান্ত চিত্তে দ্বীনের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা করার পাকা পোখ্ত সিদ্ধান্ত ও সংকল্প গ্রহণ করে নিয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের নফস বা প্রবৃত্তিকে পুরোপুরি ভাবে জ্ঞান-বিবেক-

www.pathagar.com

বুদ্ধির অধীন বানিয়ে নিয়েছে এবং যার মনে-মগযে- প্রকৃতিতে নেকী ও সততা এমন গভীর ভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে, বিরোধীদের কোন অপকর্ম এবং কোন নিকৃষ্ট আচারণই তাকে তার উচ্চ মর্যাদার স্থান হতে টেনে নীচে নামাতে পারে না।

অতঃপর দ্বিতীয় যে গুণের কথাটি মহান আল্লাহ্ বলেছেন তা হলো–

وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ **এই মর্যাদা লাভ করতে পারে কেবল তারাই যারা বড়ই ভাগ্যবান।**

যারা আল্লাহ্র দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়, নিজেরা নেক কাজ করে এবং সকল বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে নিজের মুসলমানিত্ব জাহির করতে পারে এবং শত্রুদের গালাগালি ও কটু কথার প্রতিউত্তরে অতি উত্তম কথা বলে,খারাপ আচরণের মোকাবেলায় অতি উত্তম আচরণ কেবল তারাই দেখাতে পারে যারা ধৈর্যশীল, ভাগ্যবান। অতি উচ্চমানের লোকেরাই এসব গুনে গুনান্বিত হতে পারে। আর যেসব লোকের মধ্যে এসব গুন থাকবে, তাকে সফলতার মঞ্জিল হতে কোন ব্যক্তিই বঞ্চিত করতে পারবে না। নীচু প্রকৃতির লোকেরা নিজেদের চক্রান্ত ও জঘন্য ষড়যন্ত্র ও অমানুসিক আচরণ দ্বারা তাকে পরাজিত করবে তা কোন ভাবেই সম্ভবপর নয়।

শিক্ষা ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে আলোচ্য আয়াতগুলোর দীর্ঘ ব্যাখ্যা পেশা করলাম। এখন অত্র আয়াতগুলোতে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো -

● আল্লাহ্ তাআলাকে একমাত্র রব বা প্রতিপালক হিসেবে মেনে নিয়ে ঘোষণা দিতে হবে এবং সকল কিছুর লোভ-লালসা ও বাধাকে উপেক্ষা করে তার উপরই অটল-অবিচল থাকতে হবে।

● যদি কেউ আল্লাহ্ তাআলাকে একমাত্র রব বা প্রতিপালক হিসেবে মেনে নিয়ে তার উপরই অটল-অবিচল থাকে, তাহলে তার সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। তা অবতীর্ণ হয় দুনিয়ার জীবনে, কবরে এবং কিয়ামতের সময়েও।

● আল্লাহ্র উপর অটল-অবিচলরূপে যারা থাকে তাদের উপর ফেরেশতা নাযিল হয় এবং সকল কিছু থেকে অভয় দান করে চিন্তামুক্ত থাকার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা দান করে।

www.pathagar.com

● ফেরেশতারা এতো সুসংবাদ দান করে যে, তোমাদের এই আমলের জন্য বার বার ওয়াদাকৃত আল্লাহ্‌র জান্নাত রয়েছে।

● মুমিন লোকদেরকে অভয় দিয়ে ফেরেশতারা বলে আমরা দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের সংগী-সাথী এবং আখেরাতের জীবনেও তোমাদের অভিভাবক বা বন্ধু।

● আল্লাহ্‌কে রব হিসেবে যারা গ্রহণ করবে এবং তার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদেরকে এমন জান্নাত দেয়া হবে যা নিয়ামতে পরিপূর্ণ। মনে যা চাইবে তাতো পাবেই এমন কি যা না চাইবে তাও এনে হাজির করা হবে। যেমন বড় মাপের মেহমানদের সামনে মেহমানদারীর সামগ্রী আনা হয়।

● জান্নাতে অতি উত্তম পাওনা হলো স্বয়ং দয়ালু,ক্ষমাশীল মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মেহমানদারী, যা দুনিয়া এবং আখেরাতের জীবনে এর চেয়ে উত্তম মেহমানদারী হতে পারে না।

● কঠিন প্রতিকুল পরিবেশও মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেয়া, নিজে সৎ ও নেক আমল করা এবং নিজেকে মুসলিম হিসেবে ঘোষণা দেওয়া।

● ভাল বা নেক এবং মন্দ বা খারাপ সমান হতে পারে না। ভাল ভালই এবং মন্দ মন্দই। সুতরাং দাওয়াতী কাজ করতে যেয়ে যদি কেউ মন্দ বা কটু কথা বলে তাহলে তার জবাবে নেক ও অতি উত্তম কথা দ্বারা জবাব দেওয়া। আর যদি খারাপ আরচণ করে বা ক্ষতি করে তা হলে তার বিনিময়ে ক্ষতি না করে বরং কোন উপকার করে দেওয়া, বিপদের সময়ে এগিয়ে যাওয়া।

● যদি কঠোর দুষমনদের সাথে এ ধরনের অতি উত্তম কথা, কাজ এবং আরচণ আমরা দেখাতে পারি, তাহলে সেই কঠিন দুষমনও পরম অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যেতে পারে।

● অবশ্য কঠিন প্রতিকুল পরিবেশ এবং বাধার মুখেও অতি উত্তম কথা কাজ ও আচারণ দেখানোর জন্য অতি উদার, ধৈর্যশীল এবং সহনশীল হতে হবে।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! সূরা হা-মীম-আস সাজদাহ থেকে যে দারস পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল অথবা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর দারস থেকে আমরা যেসব মহামূল্যবান শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে দারস শেষ করছি। মাআসমালাম।

www.pathagar.com

ছয়

দাওয়াতে দ্বীনের কাজে অধৈর্য হলে চলবে না

(সূরা আনয়াম-৩৩-৩৬)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ
الصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ- اَعُوْذُ بِا اللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ
الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا
يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ-
وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا
كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ
اللّٰهِ وَلَقَدْ جَآئَكَ مِنْ نَّبَاِئِ الْمُرْسَلِيْنَ- وَاِنْ كَانَ
كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ
نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ط
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ
الْجٰهِلِيْنَ- اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ط اَلْمَوْتٰى
يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ-

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে– (৩৩) হে মুহাম্মাদ! আমি জানি, এরা যেসব কথাবার্তা বলে থাকে তাতে তোমার বড়ই মনে কষ্ট হয়, কিন্তু এরা কেবল তোমাকেই অমান্য করছে না, প্রকৃতপক্ষে এই যালেমরা আল্লাহ্‌র বাণী ও নিদর্শনসমূহকেই মানতে অস্বীকার করছে। (৩৪) তোমার পূর্বেও বহু সংখ্যক রসূলকে মিথ্যারোপ করা হয়েছে; কিন্তু এই মিথ্যারোপ ও কষ্ট নির্যাতন তাঁরা বরদাস্ত করে নিয়েছে। ফলে শেষ পর্যন্ত আমার সাহায্য তাঁদের কাছে এসে পৌঁছেছে। আল্লাহ্‌র বাণী বা কথা পরিবর্তন করার

www.pathagar.com

ক্ষমতা কারো নেই, (হে নবী) পূর্ববর্তী নবীদের সম্পর্কে খবরা-খবর তো তোমার কাছে পৌঁছেছে। (৩৫) এর পরেও যদি তাদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা সহ্য করা তোমার পক্ষে কঠিন হয় তাহলে তোমার শক্তি থাকলে যমীনে কোন সুড়ংগ তালাশ করো, অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে নাও এবং তাদের সামনে কোন নিদর্শন পেশ করার চেষ্টা করো। আল্লাহ্ চাইলে তো এসব লোককে তিনি একত্রিত করে হেদায়াত করতে পারতেন। অতএব তুমি অজ্ঞ-মুর্খ লোকদের মতো হয়ো না। (৩৬) আসলে তোমার দাওয়াত পেয়ে তারাই সাড়া দেয় যারা শুনতে পায়; আর যারা মুর্দা তাদেরকে তো আল্লাহ কবর হতেই জিন্দা করে উঠাবেন। তখন আল্লাহর সামনে বিচারের জন্য তাদেরকে আনা হবে।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ قَدْ -নিশ্চয় বা অবশ্য অবশ্যই। نَعْلَمُ -আমরা জানি। اِنَّهٗ -নিশ্চয় তা। لَيَحْزُنُكَ-তোমাকে অবশ্যই বিষন্ন করে বা মনোকষ্ট দেয়। يَقُوْلُوْنَ-তারা বলে। فَاِنَّهُمْ -তবে নিশ্চয় তারা। لَا -না। يُكَذِّبُوْنَكَ -তোমাকে মিথ্যারোপ করে। لٰكِنَّ -কিন্তু। بِاٰيٰتِ اللّٰهِ-আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ। يَجْحَدُوْنَ-মানতে অস্বীকার করে। لَقَدْ--নিশ্চয়ই। كُذِّبَتْ-মিথ্যারোপ করা হয়েছে। قَبْلِكَ-তোমার পূর্বে। فَصَبَرُوْا -অতঃপর তারা ধৈর্য ধারণ করেছে। عَلٰى -এর উপর। مَا - যা কিছু। كُذِّبُوْا -তাদের মিথ্যারোপ করা হয়েছে। اُوْذُوْا -তাদের কষ্ট দেয়া হয়েছে। حَتّٰى-যতক্ষণ না। اَتٰهُمْ-তাদের কাছে এসেছে। نَصْرُنَا -আমাদের সাহায্য। مُبَدِّلَ -কোন পরিবর্তনকারী। لِكَلِمٰتِ-বাণী সমূহের। جَاءَكَ-তোমার কাছে এসেছে। نَبَاِى -খবর। مُرْسَلِيْنَ -প্রেরিত পুরুষদের। اِنْ -যদি। كَانَ -হয়। كَبُرَ -কষ্টকর। عَلَيْكَ-তোমার উপর। اِعْرَاضُهُمْ -তাদের উপেক্ষা করা বা এড়িয়ে যাওয়া। اِسْتَطَعْتَ -তুমি সমর্থ হও। تَبْتَغِىَ -তুমি সন্ধান করো। نَفَقًا-কোন সুড়ঙ্গ। -اَوْ-অথবা। -

www.pathagar.com

سُلَّمًا –সিঁড়ি। فَتَاْتِيَهُمْ –অতঃপর তাদেরকে এনে দাও। بِاٰيَةٍ–কোন নিদর্শন। لَوْ –যদি। شَاءَ اللّٰهُ –আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন। لَجَمَعَهُمْ–তাদের অবশ্যই একত্রিত করতেন। عَلَى الْهُدٰى –হেদায়াতের উপর। فَلَا–অতএব না। تَكُوْنَنَّ –তুমি হয়ো। اِنَّمَا –প্রকৃতপক্ষে। يَسْتَجِيْبُ–ডাকে সাড়া দেয়। يَسْمَعُوْنَ –তারা শুনে। اَلْمَوْتٰى–মৃত্যু বা মুর্দা। يَبْعَثُهُمْ–তাদের পুনর্জীবিত করবেন বা উঠাবেন। ثُمَّ–অতঃপর বা এরপর। اِلَيْهِ–তারই দিকে। يُرْجَعُوْنَ–তাদের ফিরিয়ে আনা হবে। قَالُوْا –তারা বলে। لَوْ –কেন বা যদি। نُزِّلَ–নাযিল করা হয়। عَلَيْهِ–তার উপর। -اٰيَةٌ– কোন নিদর্শন। رَبِّهٖ –তার রবের। قَادِرٌ –সক্ষম। -يُنَزِّلَ –নাযিল করবেন। اَكْثَرَهُمْ –তাদের অধিকাংশই।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম অয়ারাহমাতুল্লাহি অয়াবারাকাতুহ্। আমি আপনাদের সামনে দারসে কুরআন পেশ করার জন্য সূরা আনযাম এর ৩৩-৩৬ আয়াত পর্যন্ত মোট ৪টি আয়াত তেলাওয়াত ও তরজমা পেশ করেছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিক ভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমিন।

সূরার নামকরণ ঃ এই সূরার ১৬তম রুকুর ১৩৬ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত
-وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَمِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا
(অর্থাৎ 'লোকেরা আল্লাহ্‌র জন্য নিজেরই পয়দা করা ক্ষেত-খামারের ফসল ও গৃহপালিত পশু হতে একটি অংশ নির্দিষ্ট করেছে')। اَلْاَنْعَامِ (গৃহপালিত পশু) শব্দটিকেই সূরার নামকরণ হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। যদিও সূরার ১৬ ও ১৭ রুকুতে কোন গৃহপালিত পশু হালাল ও কোনটি হারাম হওয়া সম্পর্কে আরবদের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা প্রতিবাদ করা হয়েছে, তথাপিও সূরাটির নামকরণ কোন 'শিরোনাম' হিসেবে করা হয়নি। বরং অন্যান্য সূরার

www.pathagar.com

ন্যায় 'প্রতীকী' বা 'চিহ্ন' হিসেবে করা হয়েছে। তবে যা করা হয়েছে তা ওহীর নির্দেশেই করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হবার সময়কাল ঃ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মাক্কী। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, এই সূরাটি মক্কা শরীফে একই সংগে নাযিল হয়েছে। হযরত মাআ'য ইবনে জাবালের চাচাতো বোন আসমা বিনতে ইয়াজীদ (রাঃ) বলেন ঃ এই সূরা যখন নবী করীম (সাঃ) এর উপর নাযিল হচ্ছিল, তখন তিনি এক উটের উপর চড়া ছিলেন, আর আমি তার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওহীর চাপে উটের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে গিয়েছিলো। মনে হচ্ছিল, তার মেরুদন্ড বুঝি এক্ষুণি ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। হাদীসে একথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, যে রাতে এই সূরাটি নাযিল হয়, সেই রাতেই নবী করীম (সাঃ) এটা লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন।

এই সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্টভাবে মনে হয় যে সূরাটি সম্ভবত মাক্কী জীবনের শেষ দিকে নাযিল হয়েছে। আসমা বিনতে ইয়াজীদের উপরোক্ত হাদীসও এর সত্যতা প্রমাণ করে। কেননা, তিনি ছিলেন আনসার গোত্রের মাহিলা। হিজরাতের পরে তিনি ইসলাম কবুল করার পূর্বে শুধু ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণেই যদি তিনি রাসূলে করীম (সাঃ) এর নিকট মক্কায় হাজির হয়ে থাকেন, তবে তা অবশ্যই মক্কী জীবনের শেষ বৎসরই সম্ভব হয়ে থাকবে। কেননা, এর আগে ইয়াসরাববাসীদের (মদীনা) সাথে নবী করীম (সাঃ) এর সম্পর্ক খুব গভীর ও নিকটতম ছিলনা এবং সেই কারণেই সেখানকার কোন মহিলার পক্ষে তাঁর দরবারে হাজির হওয়াও সম্ভভপর হতে পারে না।

সূরাটি নাযিল হওয়ার উপলক্ষ ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল নির্ধারিত হওয়ার পর আমরা অতি সহজেই এর নাযিল হওয়ার উপলক্ষ সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। ইসলামে দাওয়াত ও প্রচারের কাজ করতে করতে আল্লাহ্‌র রাসূলের ১২টি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। কুরাইশদের শত্রুতা, বিরুদ্ধতা ও যুলুম-নির্যাতনের মাত্রা চরম সীমায় পৌঁছেছে। ইসলাম কবুলকারীদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক নব মুসলিম তাদের যুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরাত করতে বাধ্য হয়েছে। রাসূলের সাহায্য ও সহযোগীতা করার জন্য না চাচা আবু তালিব জীবিত ছিলেন, আর না ছিলেন প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজাতুল কুবরা। এইজন্য সকল প্রকার বৈষয়িক আশ্রয়-প্রশ্রয় হতে বঞ্চিত হয়ে তিনি কঠিন বাধা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ইসলাম প্রচার ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাঁর প্রচার ও প্রভাবে মক্কা এবং তার

www.pathagar.com

আশপাশের গোত্রগুলোর মধ্যেও বহু সৎ লোক পরপর ইসলাম কবুল করে যাচ্ছিল। কিন্তু গোটা আরব জাতি সামগ্রিকভাবে তা প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করার জন্যই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল। যেখানেই কোন লোক ইসলামের দিকে সামান্য আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করতো– তাকেই ঠাট্টা-বিদ্রুপ, তিরস্কার, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট, সম্পর্কচ্ছেদ প্রভৃতি আঘাতে জর্জরিত ও পর্যদুস্ত করে ছাড়তো। এমনি এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে কেবলমাত্র ইয়াসরীব বাসিরাই 'বায়আতে আকাবার' মাধ্যমে ইসলাম কবুল করেছিলো এবং কোন প্রকার বাধা ছাড়াই ইসলামের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

মদীনায় ইসলামের এই সামান্য প্রচার ও প্রসার ভবিষ্যতে যে বিপুল সম্ভাবনা নিহিত ছিলো তা কোন স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ দেখতে পেত না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানুষ শুধু এতটুকুই দেখতে পেত যে, ইসলাম একটি দুর্বলতম আন্দোলন। তার পেছনে কোন শক্তির সাহায্য সহযোগীতা বর্তমানে নেই। তার নেতা নিজ বংশের দুর্বলচেতা কয়েকজন লোকের সাহায্য ছাড়া আর কোন শক্তিরই অধিকারী নয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন অসহায় আশ্রয়হীন বিচ্ছিন্ন লোক নিজেদের বাপ-দাদার প্রথা ও আদর্শকে পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে মাত্র। আর এর ফলে তাদেরকে সমাজ থেকে দূরে ঠেলে দেয়া হয়েছে। উপরে বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সূরাটি নাযিল হয়। এর আলোচ্য বিষয় সমূহকে সাতটি বড় বড় ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো–

এক. শিরককে বাতিল করে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহবান।

দুই. এই দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন, এর পরবর্তী জীবন বলে কিছুই নেই এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস বা ধারণার প্রতিবাদ।

তিন. জাহেলী যুগের লোকদের মনে বদ্ধমূল অমূলক ধারণা-খেয়ালের প্রতিবাদ।

চার. সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য ইসলামের উত্থাপিত নৈতিক মূলনীতি শিক্ষাদান।

পাঁচ. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর আন্দোলন সংগ্রামের বিরুদ্ধে লোকদের উত্থাপিত প্রশ্ন ও আপত্তি সমূহের জবাব।

ছয়. দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন সংগ্রাম করার পরেও আন্দোলন ফলপ্রসূ না হওয়ার ফলে নবী করীম (সাঃ) ও সাধারণ মুসলমানদের মনে যে ব্যাকুলতা, অস্থিরতা ও মনভাব অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছিল সে সম্পর্কে শান্তনা প্রদান।

সাত. ইসলামে অবিশ্বাসী ও বিরোধী লোকদের উপেক্ষা, অবহেলা, অজ্ঞতা ও

www.pathagar.com

উদাসীনতার কারণে আত্মহত্যামূলক নীতি অবলম্বনের দরুন তাদেরকে নসীহত করা, সাবধান করা, সতর্ক এবং ভীতি প্রদান করা।

আলোচ্য আয়াত সমূহের বিষয়বস্তু ঃ দাওয়াতী কাজে বিরোধীদের বিমুখতা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং অসৌজন্যমূলক আচরণে মনে কষ্ট না পাওয়া। তাছাড়া দাওয়াতী কাজে তাড়াতাড়ি এবং আশানুরূপ ফল লাভ না করার কারণে অধৈর্য না হওয়া।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে দারসের জন্য প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় ধারণা প্রদান করলাম। এখন আমি আপনাদের সামনে আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি।

আল্লাহ্ তাআলা মোহাম্মদ (সাঃ)কে সম্বোধন করে গোটা মুসলিম উম্মাহকে অবহিত করে বলেন ঃ

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ.

হে মুহাম্মদ (সঃ)! আমি জানি; এরা যেসব কথাবার্তা বলে থাকে তাতে তোমার বড়ই মনোকষ্ট হয়, কিন্তু এরা কেবল তোমাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না, বরং এই জালেমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকেই অস্বীকার করছে।

নবী করীম (সাঃ) যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্র বাণী শুনাবার কাজ শুরু করেননি, ততদিন পর্যন্ত তাঁর জাতি মক্কার লোকেরা তাঁকে 'আল আমীন' বা 'সত্যবাদী' হিসেবে মনে করতো এবং তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ছিলো। কিন্তু যখন তিনি তাদের সামনে আল্লাহ্র পয়গাম পেশ করা শুরু করলেন তখন থেকে তারা তাকে অমান্য ও অস্বীকার করতে লাগলো। এর ফলে রাসূল (সাঃ) মনে খুব কষ্ট পেতে লাগলেন এবং মনো ভাঙ্গা হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ্ তাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ.

কাফেরেরা প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করে না বরং তারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতিই মিথ্যারোপ করে।

মক্কার কাফেরদের মধ্যে এমন কোন বাপের বেটা ছিলো না যে রাসূলে কারীম (সাঃ)কে মিথ্যাবাদী বলার দুঃসাহস রাখে। তাঁর কোন প্রাণের শত্রুও কখনো তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেনি যে মুহাম্মদ (সাঃ) দুনিয়ায় কোন ব্যাপারে

www.pathagar.com

কখনো কোন মিথ্যা বলেছে। তারা তাঁর যা কিছু বিরোধীতা করেছে তা তাঁর নবী হওয়ার দিক দিয়েই করেছে। এ ব্যাপারে রাসূলের সবচেয়ে বড় দুষমন আবু জেহেলের মনোভাব সংক্রান্ত দু'টি ঘটনাও উল্লেখ রয়েছে।

প্রথম ঘটনা হলো ঃ একবার কাফের সর্দার আখলাস ইবনে শরীক ও আবু জাহলের মধ্যে স্বাক্ষাৎ হলে আখলাস আবু জাহলকে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আবুল হিকাম [আরবে আবু জাহল আবুল হিকাম (পন্ডিতের বাপ বা জ্ঞানাধর) নামে খ্যাত ছিলো। ইসলামের যুগে কুফরী এবং দ্বীনের অজ্ঞতার কারণে তাকে 'আবু জাহল' মুর্খতার বাপ বা মুর্খতাধর উপাধি দেয়া হয়।] আমরা এখন দু'জন একান্তে আছি। আমাদের কথাবার্তা কেউ শুনবে না, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে তোমার প্রকৃত ধারণা কি আমাকে সত্যি করে বলো তো ? তাকে সত্যবাদী মনে করো না মিথাবাদী ? আবু জাহল আল্লাহ্র কসম খেয়ে বললোঃ নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সত্যবাদী। তিনি সারা জীবন মিথ্যা বলেননি। কিন্তু ব্যাপার হলো এই যে, কোরাইশ গোত্রের একটা শাখা 'বনী কুসাই' এসব গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী হবে, আর অন্যান্য কোরাইশরা মাহরুম হবে– এটা আমরা কিভাবে সহ্য করতে পারি ? পতাকা বনী কুসাই-এর হাতে রয়েছে। হারাম শরীফে হাজীদেরকে পানি পান করানোর গৌরবজনক কাজটিও তারাই করে। কাবা ঘরের পাহারাদারী ও চাবি তাদেরই অধিকারে। এখন যদি আমরা নবুওয়াতও তাদেরই ছেড়ে দেই, তাহলে অন্যান্য কোরাইশদের হাতে কি থাকবে ?

দ্বিতীয় ঘটনা হলো ঃ হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার আবু জাহল নিজে নবী করীম (সাঃ)এর সাথে কথা প্রসংগে বলে, হে মুহাম্মদ আমরা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিনা, কিন্তু আপনি যা কিছু প্রচার করছেন আমরা তাকেই মিথ্যা বলছি।

কাফেরদের উপরোক্ত মনোভাব এবং তাদের ভূমিকার কারণেই আল্লাহ্পাক তাঁর নবীকে এই বলে শান্তনা দিচ্ছেন যে, এখানে মূলতঃ তোমাকে কেউ মিথ্যাবাদী বলছে না বা অস্বীকার করছে না। বরং মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে আমার বাণীকে এবং অস্বীকার করছে আমাকে। এসব কিছুর পরও যখন আমি সব কিছুকে উপেক্ষা করছি এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সবকিছুকে বরদাশত করে যাচ্ছি। তখন তোমার চিন্তিত হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে এবং খামাখা মনে কষ্ট নেয়ারই বা কি প্রয়োজন আছে ?

www.pathagar.com

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! নবী (সাঃ) থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যারাই দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করেছে, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে যমীনে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-সংগ্রাম করেছে তখনই তাদেরকে বাধা দেয়া হয়েছে, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে, যুলুম-নির্যাতন করা হয়েছে, মানসিক, দৈহিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কষ্ট দেয়া হয়েছে। আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে কাফের মুশরেকরা বা খোদাদ্রোহীরা যারাই একাজ করেছে তারা 'দায়ী' বা আল্লাহ্‌র দিকে আহবান কারীদের বিরুদ্ধে এসব কিছু করে নাই বরং এসব করেছে আল্লাহ্‌র দ্বীনের বিরুদ্ধে, আল্লাহ্‌র বাণীর বিরুদ্ধে। তাদের দুনিয়ার স্বার্থ সংরক্ষণের পক্ষে।

আল্লাহ্ তাআলা মুহাম্মদ (সাঃ)কে দাওয়াতে দ্বীনের কাজে আরো আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদানের জন্য পূর্ববর্তী নবীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন ঃ

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاۤءَكَ مِنْ نَّبَاِئ الْمُرْسَلِيْنَ-

(হে নবী!) তোমার পরেও বহু নবী রাসূলকে মিথ্যাবাদী সাইবস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই মিথ্যাবাদীতা ও তাঁদের উপর জ্বালাতন-নির্যাতনে তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং বরদাস্ত করে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমার সাহায্য তাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। আল্লাহ্‌র বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। তোমার কাছে তো পূর্বের নবীদের কিছু কাহিনী বা খবরা-খবর পৌঁছেছে।

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক দ্বীনের 'দায়ী' ও আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী ও এর বিরোধীদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত এটা চিরাচরিত নিয়ম। এটা রদ করার ক্ষমতা কেউ রাখে না। এসব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে চালুকৃত নিয়ম-বিধান। এটা ঈমানের দাবীদার ও সত্যপন্থীদের যাচাই-বাচাই-এর স্থায়ী মানদন্ড। সুতরাং আদম (আঃ) থেকে শুরু করে অতীতে যতো নবী রাসূল এসেছে তাদেরকে এবং তাঁদের সংগী-সাথীদেরকে এক দীর্ঘ মেয়াদী যাচাই-বাচাই-এর পরীক্ষার আগুনে উত্তপ্ত হতে হয়েছে। তাদেরকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হয়েছে। আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ ও কুরবাণীর মাধ্যমে নিজেদের ঈমানের মজবুতি, পরিপক্কতা এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র উপর

নির্ভরতার কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে। তাদেরকে কঠিন বিপদ-মুসিবতের পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। কেননা, জাহেলিয়াতের উপর বিজয় লাভের জন্য পরীক্ষিত মজবুত ঈমান, উন্নত চরিত্র, মহান নৈতিকতা এবং আল্লাহ্‌র উপর অগাধ-আস্থার প্রয়োজন। আর যখনই তাঁরা এসব কিছুর প্রমাণ দেখাতে পেরেছে তখনই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিজয়ের জন্য বাকী সাহায্যটুকু এসে হাজির হয়ে গেছে। এই চিরাচরিত নিয়ম এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের আগে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং হে নবী (সাঃ) শুধু তোমাকেই নয়, বরং তোমার আগের নবী রাসূলদেরকে একই কারণে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে, তাদেরকে অমান্য করেছে। তাদের আনীত দ্বীনকে মিথ্যা সাইবস্ত করেছে এবং অস্বীকার করেছে। তাদেরকে মানসিক, দৈহিক ও আর্থিক ভাবে কষ্ট-যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে। অথচ তাঁরা এসব কিছুকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে ধৈর্য ধারণ করেছে এবং সব কিছুকে বরদাস্ত করেছে। আর তখনই আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদের কাছে সাহায্য এসে পৌঁছেছে। যেমন, মহান আল্লাহ্ পাক সূরা বাকারার ২১৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করে বলেন–

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ–

তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে চলে যাবে ? অথচ এখনও তোমাদের পূর্বের লোকদের মতো বিপদ-আপদ আসেনি। তাদের উপর তো এসেছিলো বহু বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট। তাদেরকে (বাতিলদের) অত্যাচার-নির্যাতনে এমন ভাবে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছিলো যে, শেষ পর্যন্ত তৎকালীন রাসূল এবং তাঁর সংগী-সাথীরা আর্ত চিৎকার করে বলে উঠেছিলো কখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে ? তখন তাদেরকে শান্তনা দিয়ে বলা হয়েছিলো যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য অতি নিকটে। কোরআনের এই আয়াতেও প্রমাণিত হয় যে, অতীতের নবী রাসূল এবং তাদের সংগী-সাথীদেরকে তৎকালীন খোদাদ্রোহীদের যুলুম-নির্যাতন দ্বারা তাদের

www.pathagar.com

পরীক্ষা করেছিলেন এবং এই পরীক্ষা থেকে উদ্ধারের জন্য তারা আল্লাহ্‌র সাহায্যই কামনা করেছিলো এবং এক পর্যায়ে আল্লাহ্‌র সাহায্য এসে পৌঁছেছিলো। অতীতের নবী এবং ঈমানদার লোকদের কঠিন এবং লোমহর্ষক নির্যাতনের চিত্র হযরত খাব্বারের বর্ণিত হাদীসে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) নিজে তুলে ধরে বলেনঃ

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَ هُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهٗ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا اَلَا تَسْتَنْصِرُ اَلَا تَدْعُوْ لَنَا ؟ فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُلَهٗ فِى الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا فَيُجَاءُ بِا الْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهٖ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُهْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهٖ وَعَظْمِهٖ فَمَا يَصُدُّهٗ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهٖ وَاللّٰهِ لَيَتِمَّنَّ هٰذَا الْاَمْرُ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهٖ وَ لٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ-

হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল-ল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এমন এক সময় অভিযোগ করলাম যখন তিনি কাবা ঘরের ছায়ায় চাদর দিয়ে বালিশ করে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা অভিযোগ করলাম, (কাফেরদের যুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য। হে রাসূল!) আমাদের জন্য কি আপনি সাহায্য প্রার্থনা করবেন না ? আমাদের জন্য কি দোআ করবেন না ? তিনি প্রতিউত্তরে বললেন ঃ (যেনে নাও) তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের ধরে এনে মাটিতে গর্ত করে তাতে পুঁতে দেয়া হতো। তারপর তাদের মাথা বরাবর করাত চালিয়ে দ্বিখন্ডিত করে দেয়া হতো। কাকেও কাকেও লোহার আঁচড়া দিয়ে দেহের গোশত্ ও হাড়কে আলাদা করে দেয়া হতো। কিন্তু এ নির্মম অত্যাচারেও তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিরত রাখতে পারেনি। আল্লাহ্‌র কসম! এ দ্বীন পরিপূর্ণ ভাবে বিজয়ী হবেই। তখন এমন এক দিন

www.pathagar.com

আসবে যখন কোন ভ্রমণকারী নির্বিঘ্নে 'সানআ' থেকে 'হাযরা মাউত' পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে। তখন আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে হবে না। আর মেষ পালের জন্য শুধু বাঘের ভয় ছাড়া আর কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা খুব তাড়াহুড়ো করছো। (বুখারী)।

এই হাদীস থেকে অতীতের ঈমানদার লোকদের দ্বীন পালন, দ্বীনের দাওয়াত এবং দ্বীনের আন্দোলনের জন্য কি ধরনেরই না নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে একবার চিন্তা করলে লোম শিহরিয়া উঠে।

অতএব হে নবী (সাঃ) তুমি মক্কার অত্যাচারী কাফেরদের পক্ষ থেকে এসব যুলুম-নির্যাতন এবং রূঢ় আচরণের জন্য মনে কষ্ট নিও না, বরং ধৈর্য ধারণ করো এবং এসবকে বরদাস্ত করে চলো। আর এতো কিছু পরিবত দেয়ার পরও যদি তোমার কাছে এসব সহ্য ও বরদাস্ত করা সম্ভব না হয়, তাহলে তুমি ভিন্ন পথ অবলম্বন করো। আর তাহলো–

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْسُلَّمًا فِى السَّمَاۤءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

(হে মুহাম্মদ) আর যদি তাদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা তোমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়, তাহলে তোমার শক্তি থাকলে যমীনে কোন সুড়ংগ তালাশ করো। অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে নাও এবং তাদের সামনে কোন মোযেজা বা নিদর্শন পেশ করার চেষ্টা করো। আল্লাহ্ চাইলে তো এসব লোককে তিনি একত্রিত করে হেদায়াত করতে পারতেন। অতএব তুমি অজ্ঞ মূর্খের মতো হয়ো না।

হযরত নবী করীম (সাঃ) যখন দেখতেন যে, এই জাতির লোকদেরকে দ্বীনের দাওয়াত এবং ইসলামের কথা বুঝাতে বুঝাতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু এরা কিছুতেই সঠিক পথে ফিরে আসছে না, তখন অনেক সময় তাঁর মনে এই খেয়াল জাগত যে, যদি আল্লাহ্র তরফ থেকে এমন কোন মোজেযা বা নিদর্শন যাহির হতো যা দেখে এরা কুফরী ত্যাগ করে আমার নবুওয়াত মেনে নিত তা হলে কতই না ভাল হতো। আলোচ্য এই আয়াতে

www.pathagar.com

রাসূলের এই মনের বাসনারই জবাব দেওয়া হয়েছে। কথার মর্ম হলো এই যে, হে নবী ধৈর্য হারা হইও না। যে ধারায় এবং পদ্ধতিতে আল্লাহ্ তাআলা এই দাওয়াতী আন্দোলনের কাজ পরীক্ষার মাধ্যমে চালাতে চান, ধৈর্যের সাথে তা মেনে চলো। অধৈর্য হয়ো না এবং চিরাচরিত পদ্ধতির বাইরে অন্য কিছু চিন্তা বা কল্পনা করো না। যদি কোন অলৌকিক পদ্ধতিতে কাজ উদ্ধার করতে প্রয়োজন হতো তাহলে তিনি কি নিজেই এসব করতে পারতেন না ? প্রকৃতপক্ষে চিন্তা, বিশ্বাস ও নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে বিপ্লব এবং যে সুন্দর সুষ্ঠ ও কল্যাণকর সমাজ গঠনের কঠিন কাজে তোমাকে নিয়োজিত করা হয়েছে, উহাকে সাফল্যের চূড়ান্ত মনযিলে পৌঁছানোর জন্য এই সব অঘটন মোজেযা বা নিদর্শন ঘটানোর পদ্ধতি কখনই সুষ্ঠ ও কার্যকর হতে পারে না। এর পরেও যদি তুমি লোকদের জড়তা ও বিমুখোতা এবং তাদের কঠোরতা সহ্য করতে না পার এবং তাদের জড়তা দূর করার জন্য এমন কিছু অলৌকিক মোজেযা দেখানো একান্তই জরুরী বলে মনে করো, তা হলে নিজেই তার চেষ্টা করে দেখ। তোমার যতো শক্তি আছে তাও নিয়োগ করো এবং তোমার ক্ষমতা থাকলে যমীনের তলায় সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকে অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে উঠে এমন কোন মু'জিযা তালাশ করো যা দিয়ে বর্তমানে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করা যায়। হে নবী আমি আমার চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করে তোমার এই মনের বাসনা পূর্ণ করবো এ ধরনের আশা করা বৃথা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আমার পরিকল্পনায় এধরনের পথ বা পদ্ধতি গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। ধৈর্য হারা হয়ে অন্য কোন উপায় কামনা করা বা খোজাখুজি করা মুর্খ লোকদের কাজ। অতএব তুমি এসব মুর্খ লোকদের মতো হয়ে যেও না।

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! আমরা দ্বীনের দাওয়াত এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম আন্দোলন করতে গিয়ে মানুষের বিরোধীতা, বিমুখতা ও দীর্ঘ সময়কাল অতিবাহিত হয়ে যাবার কারণে অস্থির হয়ে পড়ি এবং বলি আর কতদিন লাগবে! এতো দিনও যখন কিছু হলো না তখন আর কিছুই হবে না! অথবা এও বলে থাকি এ যুগে দ্বীন কায়েম করা সম্ভব নয়! এসব কিছুই অদ্ভুত মুর্খ এবং অধৈর্য লোকদের বুলি এবং ধারণা। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা পরবর্তী আয়াতে সত্যের পথে সাড়া দানকারীদের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

إِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ط وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ-

www.pathagar.com

আসলে সত্যের দাওয়াত পেয়ে তারাই সাড়া দেয় যারা শুনতে পায়; আর যারা মুর্দা তাদেরকে তো আল্লাহ্ কবর হতেই জিন্দা করে উঠাবেন। তখন আল্লাহ্র বিচারালয়ে উপস্থিত হবার জন্যে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে সত্য দ্বীনের দাওয়াত পেয়ে কেবলমাত্র তারাই সাড়া দেয় যারা শুনে বা শুনতে পায়। এখানে يَسْمَعُوْنَ শুনতে পায় বলতে বুঝায় সেই সব লোককে– যাদের দিল জীবন্ত, প্রাণবন্ত, যারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক ও চিন্তাকে অকেজো করে দেয় নাই এবং যারা নিজেদের অন্তরের দরজার উপর হিংসা-বিদ্বেশ ও জড়তার তালা ঝুলিয়ে দেয় নাই। অর্থাৎ তারা তাদের দিল বা অন্তরকে সত্য দ্বীনের জন্য উন্মুক্ত রেখেছে। সত্যকে তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং চিরদিনের জন্য বরণ করে নেয়। আর অপর দিকে وَالْمَوْتٰى মৃত্যু বা মুর্দা বলতে সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে যারা চরম অন্ধত্ব ও মুর্খতার মধ্যে জীবন যাপন করে। যাদের কান আছে কিন্তু সত্য দ্বীনের কথা শুনে না, যাদের দেল আছে কিন্তু সত্য দ্বীনকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না, তারা শুধু অন্ধের মতো হাতড়িয়ে মরে। যারা একটা নির্দিষ্ট, গতানুগতিক ও ধরাবাধা পথে চলতেই অভ্যস্ত। সেখান থেকে সরে গিয়ে তারা নতুন কোন কথা গ্রহণ করার জন্য সম্মত হয় না। তা যতই সুস্পষ্ট ও মহা সত্যই হোক না কেন। অত্র আয়াতের শেষে মহান আল্লাহ্ বলেন–

يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ **আল্লাহ্ তাদের বিচারের জন্য উঠাবেন অতঃপর তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।** অর্থাৎ যারা সত্য দ্বীন শুনেও শুনেনা এবং মান্য করে না এসব মুর্দাদেরকে আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন বিচারের জন্য উঠাবেন এবং তাদের দুনিয়ায় জীবনের এই ভূমিকার জবাব দিহির জন্য আল্লাহ্র কাছে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ্র দরবারে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়ের/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা আনয়াম থেকে যে দরস পেশ করলাম এ থেকে যেসব শিক্ষা আমাদের জন্য রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করছি।

● আয়াতে সরাসরি মহানবী (সাঃ)কে উদ্দেশ্য করে উপদেশমূলক কথা বলা হলেও গোটা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য একই শিক্ষা রয়েছে।

www.pathagar.com

● মহানবী (সাঃ) এর মাধ্যমে গোটা উম্মতে মহাম্মদীকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করতে গিয়ে কাফের মুশরীক এবং বিরুদ্ধবাদীর পক্ষ থেকে যে মানসিক, দৈহিক এবং আর্থিক যুলুম নিপীড়ন ও মানতে অস্বীকার করার কারণে মনোকষ্ট নেয়া যাবে না।

● বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে যুলুম-নিপীড়ন এবং মানতে অস্বীকৃতি যা করা হয় তা নবীকে নয় বরং নবী যে বাণী বা হেদায়াত নিয়ে এসেছে তাকে করা হয়। কেননা, তা মানলে এ সমস্ত বিরুদ্ধ বাদীদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব এবং বৈষয়িক স্বার্থ খতম হয়ে যাবে।

● নবী মুহাম্মদ (সাঃ)সহ সকল উম্মতে মহাম্মদীকে শান্তনা এবং ধৈর্য ধারনের অনুপ্রেরণা দানের জন্য আল্লাহ্ পাক বলেন যে, অতীতের নবীদেরকে এবং তাদের গোষ্ঠীদেরকে একই কারণে একই ভাবে যুলুম-নিপীড়ন করা হয়েছে। এমনকি তার চেয়েও বেশী করা হয়েছে, কিন্তু তারা তা ধৈর্যের সাথে বরদাস্ত করে নিয়েছে।

● দাওয়াতে দ্বীন এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করতে যেয়ে অতীতের নবী এবং তাদের সংগী-সাথীদের উপর যুলুম-নীপিড়ন করা হয়েছে, তাদেরকে মানতে অস্বীকার করা হয়েছে, এমনকি উল্টো মিথাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে তখন তারা এসব কিছু অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে উপেক্ষা করার কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য এসে পৌঁছে গেছে।

● সবকিছুকে বরদাস্ত এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ এবং অতীতের নবী রাসূলদের উদাহরণ পেশ করার পরও যদি হে নবী তোমার মনে শান্তনা না আসে তাহলে তুমি নিজেই যমীনের মধ্যে ঢুকে কিংবা আকাশে উঠে কোন অ-লৌকিক মোজেযা তালাশ করে এনে এদেরকে সবাইকে হেদায়াত করে ফেল। কেননা, এতো অধৈর্য হলে তো চলবে না। কেননা, দ্বীন মানা এবং প্রতিষ্ঠার যে নিয়ম পদ্ধতি আমার পক্ষ থেকে করে দেয়া হয়েছে তার কোন ব্যতিক্রম হবে না। অতীতেও হয়নি, এখনও হে নবী তোমার বেলায় হবে না এবং ভবিষ্যতেও তোমার উম্মতদের জন্য হবে না।

● আল্লাহ্ তাআলা তার দ্বীনের প্রচার, প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা পরীক্ষার মাধ্যমেই করবেন। কেননা, এটা প্রকৃত ঈমান যাচাই-এর বড় মাধ্যম। যদি বিনা বাধায় বিনা নির্যাতন নিপীড়নে সবাই দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস করে মেনে নিত তাহলে নবী

www.pathagar.com

রাসূল পাঠানোরই বা কি প্রয়োজন ছিল। এতো দ্বন্দ্ব-ফাসাদেরই বা কি প্রয়োজন ছিলো। যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ-বিগ্রোহের বা কি কারণ ছিলো। আল্লাহ্ নিজেই তো একাজ করতে পারতেন। তিনি তো মায়ের পেট থেকেই সকলকে মুমিন করে পয়দা করতে পারতেন। অথবা, সকলকে এক জায়গায় একত্রিত করে হেদায়াত করে দিতে পারতেন। কেননা, আল্লাহ্ 'হও' বললেই তো সবকিছু হয়ে যায়।

● আসলে তো দাওয়াত তারাই কবুল করবে যারা সত্য ও হক কথা শুনে, এবং মানে। আর যারা তাদের চোখ থাকতেও দেখে না, কান থাকতেও শুনে না, অন্তর থাকতেও অনুভব করে না এরা তো মুর্দা এরা তো মেনে নিবে না এদেরকেতো কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে জিন্দা করে হাজির করা হবে এবং তাদের এই আচরণের বিচার করা হবে।

● উপরোক্ত শিক্ষাগুলো থেকে বর্তমানে আমরা যারা উম্মতে মুহাম্মদী, আমাদের কাজ হবে আল্লাহ্র দ্বীন, প্রচার-প্রসার এবং প্রতিষ্ঠার জন্য ধৈর্যের সাথে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। দৈহিক, মানসিক এবং আর্থিক ক্ষতি এবং যুলুম নীপিড়নের জন্য মনে কষ্ট নিয়ে কাজ বন্দ করে না দেয়া। বরং সব কিছুকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে বরদাস্ত করে নেয়া। কোন অলৌকিক উপায়ে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার চিন্তা না করা। আর এটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে, আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য পরীক্ষা অপরিহার্য, সেই জন্য মানসিক ভাবে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত থাকা, আর পরীক্ষা আসলে তা ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করা এবং আল্লাহ্র সাহায্যের প্রত্যাশি হওয়া। পরীক্ষার এক পর্যায়ে আল্লাহ্র সাহায্য অবশ্যই আসবে। এই জন্য তাড়াহুড়ো না করা।

আহবান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষন পর্যন্ত সূরা তাওবার ১৯-২৪ পর্যন্ত আয়াতের যে দারস পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুলত্রুটি এবং বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তার জন্য মহান আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর দারস থেকে আমরা যেসব শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি সেই তাওফীক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি।

www.pathagar.com

সাত

স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং ধন-সম্পদ মানুষের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ

(সূরা তাগাবুন-১৪-১৮)

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ
عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ
فِتْنَةٌ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ- فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا
اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَ اَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ط وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ- اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ- عٰلِمُ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে - (১৪) হে মুমিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুষমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। আর যদি মার্জনা করো, উপেক্ষা করো এবং ক্ষমা করো, তবে যেন রাখ আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (১৫) নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো একটা পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহ্র কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার। (১৬) অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্কে ভয় করো, (তাঁর কথা) শোন, আনুগত্য করো এবং ব্যয় করো। এটাই তোমাদের জন্য

www.pathagar.com

কল্যাণকর। আর যারা মনের কৃপণতা থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (১৭)যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দাও, তাহলে তিনি তোমাদের জন্যে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সহনশীল। (১৮) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের সবকিছু জানেন, তিনি পরাক্রমশীল ও প্রজ্ঞাময়।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ يٰٓاَيُّهَا-ওহে বা হে। اَلَّذِيْنَ-যারা। اٰمَنُوْا -ঈমান এনেছ। اِنَّ-নিশ্চয়। مِنْ-মধ্যে। اَزْوَاجِكُمْ-তোমাদের স্ত্রীদের। وَاَوْلَادِكُمْ-তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের। عَدُوًّا -দুষমন বা শত্রু। لَكُمْ-তোমাদের জন্যে। فَاحْذَرُوْهُمْ-অতএব তাদের থেকে সতর্ক হও। اِنْ-যদি। تَعْفُوْا-তোমরা মার্জনা করো। تَصْفَحُوْا-তোমরা উপেক্ষা করো। تَغْفِرُوْا-তোমরা মাফ করো। فَاِنَّ-তবে নিশ্চয়। غَفُوْرٌ-ক্ষমাশীল। رَحِيْمٌ-দয়াশীল, মেহেরবান। اَمْوَالُكُمْ-তোমাদের ধন-সম্পদ। فِتْنَةٌ-পরীক্ষা। عِنْدَهٗ-তাঁর কাছে। اَجْرٌ-প্রতিফল। عَظِيْمٌ- -বড়। فَاتَّقُوْا -অতএব তোমরা ভয় করো। مَا -যতটা। استطعتم -তোমরা পার। اَسْمَعُوْا -তোমরা শোন। اَطِيْعُوْا-তোমরা আনুগত্য করো। اَنْفِقُوْا-তোমরা খরচ করো। خير -উত্তম। لا نفسكم-তোমাদের নিজেদের জন্যে। مَنْ-যে। يُوْقَ-রক্ষা পেল। شُحَّ-সংকীর্ণতা। نَفْسِهٖ -তার মন। فَاُولٰٓئِكَ-তবে ঐসব লোক। هُمْ-তারাই। الْمُفْلِحُوْنَ-সফলকাম। تُقْرِضُوْا-তোমরা কর্জ বা ধার দাও। حَسَنًا -উত্তম। يُضٰعِفْهُ-তা বহুগুণ করবেন। لكم- -তোমাদের জন্যে। يَغْفِرْ-মাফ করবেন। شَكُوْرٌ-গুণগ্রাহী। حَلِيْمٌ

www.pathagar.com

-সহনশীল। عَالِمُ -পরিজ্ঞাতা বা জ্ঞান রাখেন। -الْغَيْبِ।-অদৃশ্যের। -الشَّهَادَةِ -দৃশ্যের। الْعَزِيْزُ।-মহাপরাক্রমশালী। الْحَكِيْمُ।-প্রজ্ঞাময়।

সম্বোধন ঃ দারসে কুরআন মাহফিলে/অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইসলাম প্রীয়/ ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভায়েরা/বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি অয়াবারাকাতুহ। আমি আপনাদের সামনে সূরা তাগাবুন এর ১৪-১৮ পর্যন্ত মোট পাঁচটি আয়াত তেলাওয়াত ও সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আল্লাহ্‌ পাক যেন আমাকে আপনাদের সামনে সঠিক ভাবে দারস পেশ করার তাওফীক দান করেন। আমিন।

সূরাটির নামকরণ ঃ অত্র সূরার ৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ। বাক্যের تَغَابُنْ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। تَغَابُنْ শব্দের অর্থ হলো- 'হার-জিত'। আল-কুরআনের অন্যান্য সূরার মতই এর নামকরণ প্রতীকী বা চিহ্ন হিসেবে করা হয়েছে। কোন শিরোনাম হিসেবে করা হয়নি। তবে যা কিছু করা হয়েছে তা ওহীর নির্দেশের মাধ্যমেই করা হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হবার সময়কাল ঃ সূরাটি নাযিলের সময়ের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ কোন মতামত পাওয়া যায়নি। মুকাতিল ও কলবী বলেন, এ সূরাটির কিছু অংশ মক্কায় অবতীর্ণ, আর কিছু অংশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস ও আতা ইবনে ইয়াসার বলেন, সূরার শুরু হতে ১৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত অংশটুকু মাক্কী। আর ১৪ নম্বর আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত মাদানী। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে সম্পূর্ণ সূরাটি-ই মাদানী। মদীনায় হিজরাতের পর এটা নাযিল হয়েছে। যদিও এ সূরায় এমন কোন ইশারা-ইংগিত পাওয়া যায় না যার উপর ভিত্তি করে এর নাযিল হবার সময়কাল সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত কথা বলা যেতে পারে। তবে সূরাটির মূল বিষয়বস্তু নিয়ে যদি বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে একটা ধারণা পাওয়া যায় যে, সম্ভবত সূরাটি হিজরাতের পর মাদানী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়ে থাকতে পারে। এ কারণেই হয়তো এতে কিছুটা মাক্কী সূরার ভাবধারা আর কিছুটা মাদানী সূরার ভাবধারা পাওয়া যায়। এর পরও আল্লাহ্‌ পাকই বেশী ভাল জানেন।

www.pathagar.com

সূরাটির মূল বিষয়বস্তু ঃ এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হলো ঈমান গ্রহণ ও আনুগত্য প্রকাশের আহবান এবং উত্তম চরিত্রের শিক্ষাদান। আয়াতগুলোর পরস্পর বক্তব্যের ধারা এই যে, প্রথম চারটি আয়াতে সকল মানুষকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। ৫ম আয়াত হতে ১০ম আয়াত পর্যন্ত সে সব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে যারা কুরআনের আহবানকে অগ্রাহ্য করেছে। এর পর ১১ নম্বর আয়াত হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াত সমূহে কুরআনের আহবান যারা মেনে নিয়েছে তাদের লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু ঃ মুমিনদের পরিবারের মধ্যে কোন কোন স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েকে শত্রু বলে উল্লেখ করে সতর্ক করা হয়েছে। দুনিয়ার ধন-সম্পদ এবং ছেলে-মেয়েকে আয়াতে মুমিনদের পরীক্ষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া মুমিনদেরকে আল্লাহ্‌কে যথাসাধ্য ভয় করতে এবং তাঁর আনুগত্য এবং ধন-মাল খরচ করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। আখেরাতে সফলতার জন্য দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ হিসেনে ধন-মাল ব্যয় করার আহবান জানানো হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে দারস সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করলাম। এখন আমি আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করছি। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ–

হে মুমিনগণ! তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক।

শানে নূযুল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এই আয়াতটি সেইসব মুসলমানদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা হিজরাতের পর মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে হিজরাত করে চলে যেতে মনস্থ করে। কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনেরা অর্থাৎ স্ত্রী-সন্তানেরা বাধা দেয়। (তিরমিযী, হাকেম)

আয়াতে সকল স্ত্রী এবং সকল সন্তান-সন্ততির কথা বলা হয়নি। একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে কোন কোন স্ত্রী এবং একাধিক সন্তানদের মধ্যে কোন কোন সন্তান-সন্ততি কে শত্রু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াতটির দুটি অর্থ বা তাৎপর্য রয়েছে। প্রথম অর্থ বা তাৎপর্য হলোঃ মক্কা

www.pathagar.com

থেকে হিজরাত করার পর যারা পরে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরাত করে চলে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু তাদের কুফর স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েরা তাতে বাধা সৃষ্টি করেছিলো। তারা যে তাকে মদীনায় হিজরাত করতে বাধা সৃষ্টি করেছিলো শুধু তাই নয়, বরং তারা তাকে ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় কুফরীতে ফিরে আসার জন্য চাপ প্রয়োগ করছিলো। এমনটি যে শুধু স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিদের পক্ষ থেকে হচ্ছিল তা নয় বরং কাফের স্বামীদের পক্ষ থেকে নবমুসলিম স্ত্রীকে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছিল এবং কাফের পিতার পক্ষ থেকে নবমুসলিম ছেলে-মেয়েদের একই ভাবে বরং আরো জোরাল ভাবে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছিল। এরূপ অবস্থা যে শুধু তৎকালীন আরব সমাজেই হয়েছিলো তা নয় বরং এখনও যদি কেউ অমুসলিম পরিবার থেকে ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার পরিবারের পক্ষ থেকে একই ধরনের আচরণ করে থাকে। এটাকে কেউ মেনে নিতে চায় না। পুনরায় নিজ ধর্মে ফিরে আসার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। যদি এতে সম্ভব না হয় তা হলে তাকে দৈহিক নির্যাতন করে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। এমনকি মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলখানায়ও নিক্ষেপ করে।

দ্বিতীয় অর্থ বা তাৎপর্য হলো ঃ আল্লাহ্‌র পথে চলার ব্যাপারে অথবা ইসলামী আন্দোলন করার ব্যাপারে বহু ঈমানদার পুরুষকে নিজের স্ত্রীর পক্ষ থেকে ও বহু স্ত্রীলোককে নিজের স্বামীর পক্ষ থেকে এবং অনেক পিতা-মাতাকে তাদের ছেলে-মেয়েদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এমন কোন পরিবার নেই যে, পরিবারের সকলেই আল্লাহ্‌র পথে অথবা ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত থেকে নিজের আমল-আখলাক-চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা মেনে চলে। সাধারণতঃ দেখা যায় স্বামী ঈমানদার চরিত্রবান হলে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে এমন হয় যারা তার ঈমানদারী, সততা, বিশ্বস্ততাকে নিজেদের দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করে। তারা চায় স্বামী বা পিতা তাদের জন্য এমন কাজ করুক, যার ফলে তাদের সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাই– এতে যদি তাকে জাহান্নামে যেতে হলেও তাদের কোন আপত্তি নেই। আবার এর বিপরীতে অনেক নেক চরিত্রবান স্ত্রীলোক এমন স্বামীর পাল্লায় পড়ে যে, তার ইসলামী আন্দোলন করা এবং ইসলাম ও শরীয়াত মেনে চলা স্বামীর মোটেই সহ্য হয় না। তার সাথে সাথে ছেলে-মেয়েরাও ইসলাম, ও ইসলামী আন্দোলন বিরোধী অসাদাচারী পিতার পথ ধরে এবং অসৎ কাজে জড়িয়ে পড়ে মায়ের জীবনকে দুঃসহ করে তোলে। এই অবস্থায় কুফর ও ঈমানের দ্বন্দ্বে ঈমানদার ব্যক্তির দায়িত্ব হলো, আল্লাহ্ ও তার দ্বীনের খাতিরে

www.pathagar.com

সকল প্রকার ক্ষতি ও দুঃখ-বিপদ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকা। জেল-যুলুম কিম্বা হিজরাত করে দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হলেও অথবা জিহাদে শরীক হয়ে নিজেদের জীবনকে সমূহ বিপদের মুখে ঠেলে দিতে হলেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হওয়া। প্রকৃত ঈমানের এটাই দাবী। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেই একজন ঈমানদার স্বামীর পথে তার কোন কোন স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরাই বড় বাধা ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি ইসলামী সমাজেও ঈমানদার লোকদের জীবনেও এরূপ দেখা যায়।

উপরের আলোচিত এই উভয় অবস্থার সম্মুখীন ঈমানদার লোকদের সম্বোধন করে আলোচ্য আয়াতে তিনটি সতর্কবাণী ও উপদেশ দেয়া হয়েছে।

এক. عَدُوًّا لَّكُمْ 'তারা তোমাদের শত্রু'। প্রথমতঃ আয়াতে তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, বৈষয়িক সম্পর্ক ও আত্মীয়তার দিক দিয়ে এই লোকেরা যদিও সর্বাধিক প্রিয়জন; কিন্তু দ্বীন ও ঈমানের দৃষ্টিতে এরা তোমাদের চরম শত্রু। অবশ্য সেই শত্রুতা কয়েকভাবে হতে পারে। যেমন– তারা তোমাদেরকে নেক কাজ থেকে বিরত রাখতে ও ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে পারে। কিংবা তারা তোমাদেরকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে কুফরির দিকে টানতে পারে। অথবা ইসলামী অনুশাসন মানা হতে অসহযোগীতা করতে পারে। কিংবা ইসলামী আন্দোলন করতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। অথবা তাদের মনের টান কুফরীর দিকে থাকার কারণে তোমাদের কাছ থেকে ইসলামী আন্দোলনের কোন পরিকল্পনা কিংবা যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন গোপন তথ্য জেনে তারা ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের দুশমনদের কাছে পাচার করতে পারে। এধরনের কাজে শত্রুতার ধরণ বা মাত্রা কিছুটা পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু আসলে এটা তো শত্রুতাই। সুতরাং এই অবস্থায় ঈমান, ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন যদি তোমাদের কাছে বেশী প্রিয় হয়ে থাকে, তা হলে এ দিক দিয়ে তাদেরকে শত্রু মনে করাই তোমাদের কর্তব্য। তাদের প্রেম ও মহব্বতে পড়ে তোমাদের ও তাদের মধ্যে ঈমান ও কুফরের, কিংবা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও নাফারমানীর দিক দিয়ে যে বিরাট প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর দাঁড়িয়ে রয়েছে'তা তোমাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।

দুই. فَاحْذَرُوْهُمْ 'তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে'। আয়াতে দ্বিতীয় যে উপদেশ দেয়া হয়েছে তা হলো তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। অর্থাৎ নিজের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের বৈষয়িক সুখ-সুবিধা বিধান করতে গিয়ে নিজের

www.pathagar.com

পরকালকে বরবাদ করে দিও না। তাদের প্রতি দয়া-মায়া-স্নেহ-ভালোবাসা এতটা বেশী দেখাতে যেও না যার ফলে আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে তোমার ভালোবাসা ও সম্পর্ক রক্ষা এবং ইসলাম মানার ক্ষেত্রে তারা বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। তাদের প্রতি এতো বেশী দুর্বলতা দেখাইও না ও ভরসা রেখ না। যার ফলে তারা তোমার অসতর্কতার সুযোগে ইসলামী আন্দোলন বা মুসলিম সমাজের গোপন তথ্য জানতে পেরে শত্রু পক্ষকে জানিয়ে দিতে না পারে। রাসূলে করীম (সাঃ)ও তাঁর একটি কথায় মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেন ঃ

يُؤْتَى بِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُقَالُ اَكَلَ عَيَالُهُ حَسَنَا تَهُ

কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, অতঃপর বলা হবে, এর সন্তান-সন্ততিরা তার সব নেক আমল খেয়ে ফেলেছে।

তিন. وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

আর যদি তোমরা মার্জনা করো, উপেক্ষা করো এবং ক্ষমা করে দাও, তবে জেনে রাখ আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

আয়াতে তৃতীয় যে নসিহত করা হয়েছে তা হলো মার্জনা, সহনশীলতা প্রদর্শন ও ক্ষমা করার। এর অর্থ হলো এই যে, তোমাদের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা হচ্ছে শুধু তোমাদেরকে সাবধান সতর্ক করার উদ্দেশ্যে, যেন তোমরা এই ব্যাপারে সাবধান সতর্ক থাকো এবং দ্বীন ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনকে তাদের ক্ষতি হতে রক্ষা করার চিন্তা করো, এছাড়া এর পেছনে অন্যকোন উদ্দেশ্য নেই। ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন বিরোধী কার্যকলাপ ও ভূমিকার কারণে তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্রকে মারপিট করবে কিংবা তাদের সাথে রুঢ় আচরণ ও দুর্ব্যবহার করবে অথবা তাদের সাথে সম্পর্ক এতটা তিক্ততার সৃষ্টি করবে যার কারণে তোমাদের পারিবারিক জীবনটাই দুঃসহ হয়ে উঠবে- এটা কখনও হতে পারে না বা উদ্দেশ্যও তা নয়। যদি এটা করা হয় তাহলে দু'টি বিরাট ক্ষতি হবার আশংকা রয়েছে। একটি ক্ষতি হলো এই যে, এর ফলে স্ত্রী, ছেলে-মেয়েকে সংশোধন করার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় ক্ষতি হলো এই যে, এর দরুণ সমাজে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটা বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। আশপাশের লোকেরা মুসলমান ও ইসলামী আন্দোলনের লোকদের চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতে পারে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে কিংবা

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলন করলেই বুঝি নিজের ঘরেও স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের প্রতি কঠোর ও রুঢ় আচরণকারী হয়ে যেতে হয়।

জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ এই বিষয়ে একথা জানা জরুরী যে, মক্কার জীবনে ইসলামের শুরুতে লোকেরা যখন প্রথম প্রথম ইসলাম কবুল করতেছিল, তখন তাদের একটা অসুবিধা দেখা দিচ্ছিল তা হলো যদি তাদের পিতা-মাতা কাফের থেকে যেত তা হলে তারা তাদের উপর দ্বীন-ইসলাম ত্যাগ করার জন্য চাপ দিত এবং তাদের মতই কাফের থেকে যাবার জন্য বাধ্য করতে চাইত। আর একটা অসুবিধা হতো যদি তাদের ছেলে-মেয়ে কিংবা স্ত্রী মুসলমান হতো তাহলে তাদের স্বামী ও সন্তানেরা কুফরি অবস্থায় থাকতো এবং দ্বীন-ইসলাম থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাত। এই উভয় অবস্থায় প্রথমোক্ত অবস্থা সম্পর্কে সূরা আনকাবুত এবং সূরা লোকমানে বিধান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে–

সূরা আনকাবুতের ৮ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًاطوَإِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

অর্থাৎ আমি মানুষকে তাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য জোর নির্দেশ দিয়েছি। আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছুর সাথে শরীক করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের (এই কথার) আনুগত্য করবে না।

অনুরূপ ভাবে সূরা লোকমানেও ১৪-১৫ আয়াতে বলা হয়েছে।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِى عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ– وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ–

www.pathagar.com

আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়াতে দু'বছর লেগেছে। তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার ও তোমার পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। অবশেষে আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যার সম্পর্কে তোমার জানা নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। আর যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে।

উল্লেখিত দুটি সূরার বিধান মতে দ্বীনের বিপরীত পিতা-মাতার কোন কথাই মেনে নেয়া যাবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে এবং সদ্ভাবে সহঅবস্থান করতে হবে।

আর দ্বিতীয় অবস্থার বিধান দারসের এই আয়াতেই দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, নিজেদের দ্বীনকে নিজেদের সন্তান-সন্ততির ক্ষতি হতে রক্ষা করার চিন্তা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু তাই বলে তাদের সাথে কোনরূপ কঠোরতা ও রুঢ় আচরণ করা যাবে না। বরং নম্রতা ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আর তাদেরকেও দ্বীনের পথে আনার জন্য বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্যের সাথে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে এই বলে দোআ করতে হবে–

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا–

হে আমাদের পরওয়ারদেগার। আমাদের স্ত্রীদের ও ছেলে-মেয়েদেরকে আমাদের চোখ জুড়ানো বানিয়ে দাও এবং আমাদের সবাইকে মুত্তাকীদের নেতা বা অগ্রণী বানিয়ে দাও। (সূরা ফুরকান-৭৪)

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ পাক দুনিয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেন ঃ

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ–

নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতো একটা পরীক্ষাস্বরূপ।

www.pathagar.com

আর আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে মহা পুরস্কার।

فِتْنَةٌ (ফিতনা) শব্দের অর্থ 'পরীক্ষা'। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতির মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করে দেখেন যে, এসবের মহব্বতে লিপ্ত হয়ে সে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে, না মহব্বতকে দমিয়ে রেখে স্বীয় কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়।

সূরা আনফাল এর ২৮ নং আয়াতেও মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاعْلَمُوْا اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

তোমরা জেনে রেখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্তুতি প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র।

মানুষের ঈমানের নিষ্ঠা ও সততায় সাধারণত যে জিনিস দোষ-ত্রুটির সৃষ্টি করে, আর যে কারণে প্রায়ই মানুষ মুনাফেকী, বিশ্বাস ঘাতকতা ও খিয়ানতে জড়িয়ে পড়ে, তা হলো অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সন্তান-সন্তুতির স্বার্থের প্রতি সর্বাধিক ও সীমাতিরিক্ত আগ্রহ উদ্দীপনা।এই কারণে এখানে বলা হয়েছে যে, এই মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি যার ভালোবাসায় ডুবে গিয়ে তোমরা সত্য ও সততার পথ হতে গোমরাহ হয়ে যাও, তা আসলে এই দুনিয়ার পরীক্ষাগারে তোমাদের পরীক্ষার সমাগ্রী মাত্র। তোমরা যাকে পুত্র বা কন্যা বলো, আসলে তা পরীক্ষার একটা কাগজ মাত্র। আর যাকে তোমরা জমি-জায়গা, ব্যবসার সম্পত্তি মনে করো, তাও আসলে পরীক্ষার আর একটি কাগজ বিশেষ। এসব জিনিস তোমাদের হাতে এই উদ্দেশ্যেই দেয়া হয়েছে যে, এসব দিয়ে তোমাদেরকে যাচাই-বাচাই ও পরীক্ষা করা হবে। দেখা হবে, তোমরা হক ও সত্যের পথে কতটুকু সীমা রক্ষা করে কাজ করো, দুনিয়ার দায়-দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে কতটুকু ন্যায় পথে চলতে পার, আর দুনিয়ার লোভাতুর দ্রব্য-সামগ্রীর প্রেমে বন্দী মন ও নফসকে কতখানি কাবু করে রাখো, আর এসবকে উপেক্ষা ও কাবু করে আল্লাহ্‌র পূর্ণ ও খাঁটি বান্দাহ হয়ে থাকতে পারো কি না। এসব জিনিসের হক বা অধিকার আল্লাহ্‌র নির্ধারিত মাত্রা অনুযায়ী ঠিক ঠিক ভাবে আদায় করছো কিনা।

'সন্তান-সন্তুতি ও ধন-সম্পদ পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র,' এই ক্ষেত্রে রাসূলে করীম (সাঃ) এর একটা হাদীস খুবই স্মরণীয়। রাসূলে পাক (সাঃ) বলেন ঃ **তোমার আসল শত্রু সে নয় যাকে হত্যা করলে তোমার সাফল্য হবে, আর সে তোমাকে হত্যা করলে তোমার জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। বরং হতে**

www.pathagar.com

পারে যে, তোমার আসল শত্রু তোমার সেই সন্তান যে তোমার ঔরসে জন্মলাভ করেছে। এরপর তোমার বড় শত্রু হচ্ছে তোমার সেই ধন-মাল যার তুমি মালিক হয়ে আছ। (তাবারানী, হযরত আবু মালেক আশআরী) এই কারণে আল্লাহ্ তাআলাও এই আয়াতে এবং সূরা আনফালে বলেছেন যে, তোমরা যদি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতির বিপদ হতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পার ও তাদের মহব্বতের উপর আল্লাহ্র মহব্বতকে বিজয়ী রাখতে সক্ষম হও, তা হলে আল্লাহ্র কাছে অতি মূল্যবান এবং উত্তম প্রতিফল লাভ করবে।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্কে ভয় করা সংক্রান্ত বিষয়ে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ–

কাজেই তোমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব হয় আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো। আর (তার কথা) শোন ও আনুগত্য করো এবং নিজের ধন-মাল ব্যয় করো, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

এই আয়াতের প্রথমাংশে কয়েকটি উপদেশ দেয়া হয়েছে যেমন-

প্রথম উপদেশ ঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ **অতএব তোমরা আল্লাহ্কে সাধ্যমত ভয় করো।** এ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা হয়েছে। যেমন-

সূরা আলে ঈমরানে ১০২ নং আয়াতে বলা হয়েছে اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ **তোমরা আল্লাহকে এমন ভাবে ভয় করো, যেমন ভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত।**

আবার সূরা বাকারার ২৮৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ্ তাআলা কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ চাপিয়ে দেন না। আর এখানে বলা হয়েছে, فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ **তোমাদের সাধ্যে যতটা কুলায় আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকে।** এই তিনটি

www.pathagar.com

আয়াত একত্রিত করে পাঠ ও বিবেচনা করলে মনে হয়, প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ্‌কে ভয় করার এমন একটা মানদন্ড আমাদের সামনে পেশ করা হয়েছে যে পর্যন্ত পৌঁছার জন্য প্রত্যেক মু'মিনের চেষ্টা করা উচিত। আর দ্বিতীয় আয়াতটি আমাদেরকে এই নীতিগত কথা বলা হয়েছে যে, কারও প্রতি তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করার নির্দেশ বা দাবী করা হয়নি। বরং আল্লাহ্‌র দ্বীনে মানুষ শুধু ততটুকুর জন্যই দায়ী যতটুকু করার সাধ্য তার আছে। আর দারসের অর্থাৎ সূরা তাগাবুনের আলোচ্য আয়াতটি প্রত্যেক মুমিনকে এই বলে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, সে যেন নিজের সাধ্যানুযায়ী তাক্‌ওয়া অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যায়, যার মধ্যে কোন ত্রুটি না থাকে। তার পক্ষে যতদুর সম্ভব হয় আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মেনে চলা তার কর্তব্য এবং তাঁর নাফরমানি হতে বিরত থাকা উচিত্। এ ব্যাপারে যদি সে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করে, তা হলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র পাকড়াও হতে সে রেহাই পাবে না। তবে যা তার সাধ্যের বাইরে-অবশ্য কোন কাজ তার সাধ্যের বাইরে তার মাফকাঠি আল্লাহ্ তাআলার কাছেই রয়েছে-সে ব্যাপারে তাকে দায়ী করা হবে না। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্যপূর্ণ তাক্‌ওয়া অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমিন।

দ্বিতীয় উপদেশ ঃ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا **এবং (তাঁর কথা) শোন ও আনুগত্য করো।** আল্লাহ্ তাআলা এখানে মুমিনদেরকে দ্বিতীয় যে উপদেশটি দিচ্ছেন তা হলো তোমরা আল্লাহ্ এবং রাসূলের কথা মন দিয়ে শ্রবণ করবে এবং সে অনুযায়ী আনুগত্য করবে, সেই কাজ অনুসরণ করে চলবে।

তৃতীয় উপদেশ ঃ وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ **এবং নিজের ধন-মাল ব্যয় করো, এটা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। আর যে লোক নিজের মনের সংকীর্ণতা হতে রক্ষা পেয়ে গেছে, শুধু সেই কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করবে।** মহান আল্লাহ্ তাআলা এখানে তৃতীয় যে উপদেশ দিয়েছেন তা হলো-নিজের ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার। ধন-মাল ব্যায়ের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে উদারতার পরিচয় দেয়া। তা হলে এটাই হবে তার জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতের জীবনে কল্যাণকর এবং সফলতা। এই সম্পর্কে সূরা হাশরে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

বস্তুত যেসব লোককে তাদের অন্তরের সংকীর্ণতা হতে রক্ষা করা হয়েছে তারাই কল্যাণ লাভ করবে। এখানে 'যেসব লোক রক্ষা পেয়ে গিয়েছে' বলা হয়নি, বলা হয়েছে 'যেসব লোককে রক্ষা করা হয়েছে'। এর কারণ হলো এই যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সুযোগ এবং সাহায্য ছাড়া কোন লোকই কেবলমাত্র নিজের শক্তির জোরে অন্তরের উদারতা ও বড়ত্ব অর্জন করতে পারে না। মূলতঃ এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক প্রকারের বড় অবদান। একটা অতুলনীয় নিয়ামত। شُحَّ শব্দটি আরবী ভাষায় কার্পণ্য ও বখীলী বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যখন এই শব্দটিকে 'নফস' শব্দের সাথে সম্পর্কিত করে شُحَّ النَّفْسِ বলা হবে, তখন এটা দৃষ্টিসংকীর্ণতা, সংকীর্ণ মানসিকতা ও ছোট অন্তরের অর্থে ব্যক্ত করে। আর এই অর্থ কৃপণতা বা কার্পণ্য হতেও অনেক ব্যাপক। বরং সকল প্রকার কার্পণ্যের মূল উৎস এগুলিই। এই সংকীর্ণ মানসিকতার কারণে মানুষ অন্য লোকের অধিকার স্বীকার করা ও আদায় করা তো দূরের কথা তার যৌক্তিকতাও স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত হয় না। নিজে অন্যকে দেবে সে তো দূরের কথা, অন্য কেউ যদি কাকেও কিছু দেয়, তাতেও সে মনে কষ্ট পায়। তার লোভ একটা তীব্র যে, কেবল নিজের পাওনা পেয়েই ক্ষান্ত হয় না বরং অন্যদের পাওনাটার উপরও হস্তক্ষেপ করাটা সে জরুরী বলে মনে করে। সে চায় চারদিকে যা কিছু ভালো জিনিস আছে, তা সবই সে নিজে একাই ভোগ করবে, অপরের জন্য কিছু রেখে দেবে না। আর এই কারণেই আল কুরআনে এই খারাপ ও নোংরা মানসিকতা হতে রক্ষা পেয়ে যাওয়াকে কল্যাণকর ও সফলতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর রাসূল (সাঃ) ও সংকীর্ণ মানসিকতাকে অতি খারাপ ও নিকৃষ্টতম মানসিকতার মধ্যে গণ্য করেছেন। আর এটাই হলো সব কিছুর বিপর্যের মূল উৎস। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

اِتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَ هُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ-

তোমরা সকলে লোভপূর্ণ কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, লোভপূর্ণ

www.pathagar.com

কৃপণতাই তোমাদের পূর্বের লোকদের ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদেরকে নিজেদের রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তারই প্ররোচনায় তাদের জন্য নিষিদ্ধ ও হারাম জিনিসগুলোকে হালাল বা বৈধ করে নিয়েছে। (মুসলিম, আহমদ, বায়হাকী, বুখারী)

মনের সংকীর্ণতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেন ঃ

اَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوْا وَاَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا- وَاَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا-

উহাই (সংকীর্ণতায়) তাদেরকে যুলুম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, ফলে তারা যুলুম করেছে। সীমালংঘনমূলক পাপ কাজের উস্কানী দিয়েছে, তারা তাই করেছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলেছে, ফলে তারা তাই করেছে। (আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ)

হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ **ঈমান ও লোভপূর্ণ কার্পণ্য কারও অন্তরে একত্রিত হতে পারে না। (নাসাঈ, বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান ও হাকেম)।**

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! ইসলামের এই সুমহান আদর্শ শিক্ষার ফলেই কিছু কিছু লোকের কথা বাদ দিয়ে মুসলমানেরা একটা জাতি হিসেবে দুনিয়ার বুকে আজও অন্যদের তুলনায় বেশী দানশীল এবং উদার মনের। যেসব জাতি গোটা দুনিয়ায় সংকীর্ণ মানসিকতা ও কৃপণতার দিক দিয়ে অতুলনীয়, স্বয়ং তাদের মধ্যে হতে বের হয়ে আসা লক্ষ কোটি মুসলমান নিজেদের বংশের অমুসলিমদের পাশাপাশি বসবাস করে আসতেছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে অন্তরের উদারতা ও সংকীর্ণতার মাফকাঠিতে যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, তার এই একটিমাত্র ব্যাখ্যাই দেয়া চলে এবং এছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা দেয়াও সম্ভব নহে। আর তা হলো একমাত্র ইসলামের নৈতিক শিক্ষাই মুসলমানদের অন্তরকে উদার, বড় ও প্রশস্ত করে দিয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ করযে হাসানার গুরুত্ব ও ফজিলাত উল্লেখ করে বলেন ঃ

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ-

www.pathagar.com

তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দাও, তাহলে তিনিও তোমাদেরকে উহা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ্ বড়ই মূল্য দানকারী এবং ধৈর্যশীল।

অত্র আয়াতে উদার দেলের ঈমানদার লোকদের ডেকে মহান আল্লাহ্ বলছেন যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে করযে হাসান বা উত্তম ঋণ-দাও তাহলে তোমাদের এর বিনিময়ে দু'টি প্রতিদান দেব। যে প্রতিদানের কোনো তুলনা হয় না। আর তা হলো

এক. তোমরা যা দেবে পরকালে তার বিনিময়ে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেব।

দুই. আর দুনিয়ার কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করে দিয়ে আখেরাতের নাজাতের পথকে তোমাদের জন্য সহজ করে দেব।

قَرْضًا حَسَنًا (করযে হাসানা) এর শাব্দিক অর্থ 'উত্তম ঋণ'। এই ঋণের কতকগুলো শর্ত থাকে যেমন-এর দ্বারা এমন ঋণ বুঝানো হয়েছে যা খালেস নিয়াতে কোন প্রকার স্বার্থ ছাড়াই আল্লাহ্‌র জন্য তথা আল্লাহ্‌র দ্বীনের কাজে তাঁরই দেখিয়ে দেয়া পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় বা খরচ করা হয়। যাতে কোন প্রকার রিয়া বা লোক দেখানো মানসিকতা থাকবে না। সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করার উদ্দেশ্যও শামিল থাকতে পারবে না। তা দিয়ে কারও প্রতি অনুগ্রহ দেখানো হবেনা বা যাবে না। দাতা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করবে। তাকে ছাড়া অন্য কারও নিকট থেকে কোন প্রকার প্রতিদান পাবার বা অন্য কাকেও সন্তোষ লাভ করার কোন ইচ্ছাই তার থাকবে না। এমনকি সেই দিকে একবিন্দু খেয়ালও থাকবে না। আর যদি কেউ এভাবে শর্তগুলো পালন করে খরচ করে তবে আল্লাহ্ এটাকে নিজের জন্য ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। আর একেই বলা হয় 'করযে হাসানা' বা 'উত্তম ঋণ'। আর এই ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজেই গ্রহণ করেছেন। সেই ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলা এখানে দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। তার একটি হলো- يُضٰعِفَهٗ لَكُمْ **তিনি তা তোমাদের জন্য কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন।** অর্থাৎ আল্লাহ্ এই ঋণ গ্রহণ করে শুধু আসলটায় ফেরৎ দেবেন না বরং তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন। এখানে গুণের কোন সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। এটা দাতার নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার উপর নির্ভর করে। আল্লাহ্ যার উপর যেমন সন্তুষ্ট হবেন তিনি তাকে সেই ভাবে বৃদ্ধি করে দেবেন। এই বৃদ্ধিটা টাকা বা ধন-সম্পদের বদলে টাকা বা সম্পদ নয় বরং কিয়ামতের দিন বিচারের

www.pathagar.com

সময় তার মূল্য হিসেবে উত্তম প্রতিদান জান্নাত দান করবেন। যেমন–সূরা হাদীদে মহান আল্লাহ্ বলেন –

فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗ اَجْرٌ كَرِيْمٌ

অতঃপর আল্লাহ্ তা (দাতার জন্য) কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দিতে পারেন এবং তার জন্য অতি উত্তম প্রতিদান রয়েছে। (সূরা হাদীদ-১০)

আর দ্বিতীয় যে প্রতিদান দেবেন তা হলো– وَيَغْفِرْ لَكُمْ এবং তোমাদের **অপরাধ সমূহ মাফ করে দেবেন।** অর্থাৎ সৎ উদ্দেশ্যে, নিস্বার্থ এবং খালেশ ভাবে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যখন সে দ্বীনের পথে দান বা খরচ করবে তখন আল্লাহ্ তাআলা তার এই 'উত্তম ঋণের' প্রতিদান হিসেবে দুনিয়ার ফেরেবে পড়ে শয়তানের ওয়াসওয়াসায় দাতা যেসব গুনাহ্ করেছে আল্লাহ্ তা মাফ করে দেবেন। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী এবং ধৈর্যশীল। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা মানুষের মতো অকৃতজ্ঞ নন। যেমন মানুষ মানুষের নুন খেয়ে তার স্বীকারটুকু পর্যন্ত করতে পারে না। বরং আল্লাহ্ তাআলা তার দানকারী বান্দার যে পাওনা তা তিনি কৃতজ্ঞতার সাথে পাওনাটুকু শুধু নয় বরং তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী আদায় করে থাকেন। তাই তিনি দাতার প্রতিদান হিসেবে আখেরাতের স্থায়ী জীবনের কল্যাণের জন্য কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দিয়ে এবং অপরাধগুলো মাফ করে দিয়ে চির শান্তির জায়গা জান্নাত যাবার ব্যবস্থা করে দেন। এর চেয়ে 'উত্তম ঋণদাতার' আর কিইবা প্রতিদান হতে পারে ? আর দাতার দানের উত্তম কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী আল্লাহ ছাড়া আর কেইবা হতে পারে ?

সর্বশেষে আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ **অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছুই তিনি জানেন, তিনি প্রবল; পরাক্রান্ত, সর্বজয়ী, মহাবিজ্ঞানী।** 'অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা উপস্থিত-অনুপস্থিত, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু বিষয় সম্পর্কে জানেন যা অন্য কোন সৃষ্টি জীবের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তিনি এমন শক্তিধর প্রবল যা অন্যের কারো মধ্যে তা নেই। তিনি সর্বজয়ী পরাক্রমশালী শক্তিধর এবং মহাজ্ঞানী যার তুলনা আর কারো হয় না।

www.pathagar.com

শিক্ষা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা তাগাবুনের ১৪-১৮ নং আয়াতের যেসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করা হলো তা হতে আমাদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা হলো ঃ

● মুমিনদের জন্য স্ত্রীদের মধ্যে কোন কোন স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কোন কোন ছেলে-মেয়ে দুষমনের মতো। যেমন দুষমন মানুষের ক্ষতি করে, তেমনি খোদাবিমুখ স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ে নিজেরা যেমন চরম ক্ষতির জায়গা জাহান্নামে চলে যায় তেমনি স্বামী এবং পিতাকেও তারা জাহান্নামে নিয়ে চরম ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেয়।

● শুধু স্ত্রী বা ছেলে-মেয়ে নয় বরং কোন কোন স্বামী এবং কোন কোন পিতাও স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ের জন্য শত্রু। কেননা, মুমিন স্ত্রী এবং নেককার ছেলে-মেয়ে খোদা বিমুখ অসৎ স্বামী এবং পিতার জন্য তাদেরকেও জাহান্নামে যেতে হয়।

● স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ে যদি অসৎ খোদাবিমুখ হয় তাহলে স্বামী এবং পিতা যেমন তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে তেমনি সৎ ও খোদাভীরু স্ত্রী অর্থাৎ ছেলে-মেয়েরাও অসৎ খোদাবিমুখ স্বামী এবং পিতা থেকে সতর্ক থাকবে। তারা কোন ভাবেই দুনিয়ার মহব্বতের টানে আল্লাহ্ দ্রোহী কাজ করবে না, অথবা কাফের হয়ে যাবে না, কিংবা ইসলামী আন্দোলন থেকে বিরত থাকবে না। ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলনের কোন গোপন পরিকল্পনা বা তথ্যও তাদের সামনে অজান্তে এবং অগোচরে প্রকাশ করবে না।

● স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের শাসনের ক্ষেত্রে এমন কোন আচরণ বা কঠোরতা আরোপ করা যাবে না। যাতে মানুষের মধ্যে ইসলাম তথা ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়। বরং তাদের অপরাধকে (নিজে ঠিক থেকে) মার্জনা করে যেতে হবে। অনেক বিষয়কে উপেক্ষা করতে হবে এবং ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। তাদেরকে দ্বীন তথা ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনে আনার জন্য বুদ্ধিমতা ও ধৈর্য্যের সাথে চেষ্টা চালাতে হবে এবং সাথে সাথে আল্লাহ্র কাছে তাদের জন্য দোয়া করতে হবে।

● মানুষের জন্য দুনিয়ার দু'টি প্রিয় জিনিস ধন-সম্পদ ও ছেলে-মেয়ে পরীক্ষা স্বরূপ। মুমিনেরা দুনিয়ার এই প্রিয় জিনিসের মহব্বতে ডুবে গিয়ে আল্লাহ্র মহব্বতকে জলাঞ্জলি দেবে না। আল্লাহ্ ও রাসূল এবং দুনিয়ার এই ধন-সম্পদ ও ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মহব্বতের ব্যাপারে যদি সাংঘর্ষিক হয় তা হলে দুনিয়ার এই ক্ষনস্থায়ী ধন-সম্পদ, ছেলে-মেয়ের ভালোবাসা এবং মহব্বতকে প্রত্যাখান করে আল্লাহ্ ও রাসূলের ভালোবাসা এবং মহব্বতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা, আল্লাহ্র কাছেই মানুষের চূড়ান্ত প্রতিদান রয়েছে।

www.pathagar.com

● আল্লাহ্‌কে সাধ্য মতো ভয় করে চলতে হবে যেভাবে ভয় করলে আল্লাহ্ খুশী হন।

● আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশ ভালভাবে আন্তরিকতার সাথে শোনতে হবে এবং সে অনুযায়ী পুরোপুরি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে।

● দুনিয়া এবং আখেরাতের সফলতার জন্য অন্তরের সংকীর্ণতা ও কার্পণ্যতা থেকে মুক্ত হয়ে সব দিক থেকে অন্তরকে আরো বড় ও উদার করতে হবে।

● দুনিয়ার সমস্ত ঝোঁক, প্রবণতা, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকে রাজি খুশি করার জন্য তার দ্বীনের পথে তথা ইসলামী আন্দোলনের জন্য নিজের অর্থ-সম্পদ খরচ করতে হবে।

● যখন নিছক আল্লাহ্‌র জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে ধন-সম্পদ খরচ করা হবে তখন তা আল্লাহ্‌র কাছে করযে হাসানা বা 'উত্তম ঋণ' হিসেবে গণ্য হবে।

● যখনই আল্লাহ্‌কে করযে হাসানা বা উত্তম ঋণ দেয়া হবে তখন তার বিনিময়ে পরকালে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে তার প্রতিদান দেবেন। দুনিয়ার সমস্ত গোনাহ খাতাকে মাফ করে দেবেন এবং তিনি এর বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান হিসেবে জান্নাত দান করবেন।

● প্রতিদানের, ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে হবে এই জন্য যে আল্লাহ্ হচ্ছেন সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বা দানের বিনিময় দানকারী এবং ধৈর্যশীল।

● তাছাড়া একথাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ উপস্থিত-অনুপস্থিত, দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুর জ্ঞান রাখেন এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

আহ্বান ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে সূরা তাগাবুনের শেষ আয়াতগুলো থেকে যে দারস পেশ করলাম এতে যদি আমার অজান্তে কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায় তার জন্য আমি মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর এই দারস থেকে আমরা যেসব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করলাম তা যেন বাস্তব জীবনে আমল করতে পারি সেই তৌফিক কামনা করে আমি আমার দারস শেষ করছি। মাআসসালাম।

www.pathagar.com

আট

আখেরাতে অবিশ্বাসীদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ-
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ- فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ-
وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ- فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ-
الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ- الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ-
وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ-

সরল অনুবাদ ঃ ইরশাদ হচ্ছে- (১) তুমি কি দেখেছ তাকে, যে (আখেরাতের) বদলাকে মিথ্যা সাব্যস্থ করে ? (২) ঐ ব্যক্তিই তো ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে (তাড়ায়) (৩) এবং মিসকীনের খাবার দিতে উৎসাহ দেয় না। (৪) অতঃপর ঐ নামাযীদের জন্য ধ্বংস, (৫) যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করে, (৬) যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে (৭) এবং নিত্য ব্যবহারের জিনিসও অন্যকে দেয় না।

বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ ঃ اَرَءَيْتَ -তুমি কি দেখেছ ? اَلَّذِىْ -যে বা যারা يُكَذِّبُ -মিথ্যা সাব্যস্থ করে। بِالدِّيْنِ - দ্বীন সম্পর্কে এখানে দ্বীন অর্থ বিচারের দিন। فَذٰلِكَ -অতঃপর ঐ ব্যক্তিই। يَدُعُّ-ধাক্কা দেয়। لْيَتِيْمَ -এতীমকে। لَا يَحُضُّ-উৎসাহ দেয় না। عَلٰى-উপর এখানে ব্যাপারে। طَعَامِ-খাদ্য-খাবার। الْمِسْكِيْنِ-মিসকীন। فَوَيْلٌ-অতঃপর দূর্ভোগ বা ধ্বংস। لِّلْمُصَلِّيْنَ -নামাযীদের জন্য। هُمْ-তাদের। صَلَاتِهِمْ-তাদের নামাযে (ব্যাপারে)। سَاهُوْنَ-বে-খেয়াল, বে-খবর, উদাসীন। يُرَآءُوْنَ-দেখানো কাজ। يَمْنَعُوْنَ-অন্যকে দেয় না الْمَاعُوْنَ -সাধারণ ব্যবহার্য জিনিস বা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস।

সূরাটির নামকরণ ঃ অন্যান্য সূরার মতই এই সূরাও উল্লেখিত একটি শব্দবে নামকরণ হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। এই সূরার সর্বশেষ আয়াতে উল্লেখিত

www.pathagar.com

শব্দ اَلْمَاعُوْنَ (আল মাউন) শব্দটিকে কেন্দ্র করে এই সূরার নামকরণ 'মাউন' করা হয়েছে। اَلْمَاعُوْنَ অর্থ পরিবারের ব্যবহার্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস।

সূরাটি অবতীর্ণ হবার সময় ঃ সূরাটি মাক্কী না মাদানী এই বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী সূরাটি মাক্কী। তাফসীরকারক আতা ও জাবির প্রমুখ এই মত দিয়েছেন। কিন্তু আবু হাইয়ান তাঁর "আল-বাহারুল মুহীত" গ্রন্থে ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও দহকের যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে একে মাদানী সূরা বলা হয়েছে। তাফসীরকারক মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর মতে এই সূরার ভিতরেই এমন এক সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, এই সূরাটি মক্কায় নয়, মদীনায় নাযিল হয়েছে।

তিনি বলেন, এই সূরার ৪ এবং ৫নং আয়াতে নামাযের প্রতি অবজ্ঞা অবহেলাকারী এবং লোক দেখানো নামাযীদের সম্পর্কে এক তীব্র কঠিন অভিসম্পত ও শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। আর এটাই এই সূরা মাদানী হবার একটা বড় ও অকাট্য প্রমাণ। কেননা, এই সূরার এই কথাটি মুনাফিকদের সম্পর্কে। আর এ ধরনের মুনাফিক মক্কায় দেখা যায়নি, কেবলমাত্র মদীনার সমাজেই তারা বর্তমান ছিলো। যেহেতু মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় যাবার পর রাসূল (সাঃ) এর নেতৃত্বে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আর সেই রাষ্ট্রের অধীনে থেকে সুযোগ-সুবিধা ভোগের জন্য এবং আত্ম রক্ষার জন্য অন্তরে ইসলাম না আনলেও বাহ্যিক ভাবে মুসলমানিত্ব জাহির করতো। তারা মসজিদে আসতো, জামায়াতে নামায পড়তো এবং নামাযের প্রদর্শনী করতো একমাত্র সমাজে নিজেকে মুসলমান হিসেবে জাহির করার জন্য। কিন্তু মক্কায় এ ধরনের অবস্থা মোটেই ছিলো না। সেখানে লোক দেখানো নামায আদায় করতে হতো না। জামায়াতে নামায আদায়ের কোন পরিবেশও ছিলো। সেখানে কেউ প্রকাশ্যভাবে নামায আদায় করলে তার জীবনই শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিলো না। সেখানে যে মুনাফিক একেবারেই পাওয়া যেত না তা নয়–তবে লোক দেখানো ঈমান গ্রহণকারী ও প্রদর্শনীমূলক নামায আদায়কারী যে মুনাফিকী, তা সেখানে ছিলো না। সেখানে মুনাফিক ছিলো সেই সব লোক, যারা নবী করীম (সাঃ)কে সত্যপন্থী হিসেবে জানতো এবং মানতও বটে। কিন্তু নিজেদের সরদারী, সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য কর্তৃত্ব বহাল রাখার উদ্দেশ্যে ইসলাম কবুল করতে প্রস্তুত হতো না। আবার কেউ কেউ ইসলাম কবুল করলেও নানা ভয়ে তা গোপন রাখতো। মক্কী পর্যায়ে এ ধরনের মুনাফিকদের অবস্থা সূরা আনকাবুত-এর ১০-১১আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরাটির মূল বক্তব্যঃ পরকাল বা বিচার দিনের প্রতি ঈমান না আনলে মানুষের

www.pathagar.com

কি রকমের নৈতিক চরিত্র গড়ে উঠে তা বিশ্লেষণ করাই এই সূরার মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে দারসের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্ব পেশ করলাম। এখন আমি আপনাদের সামনে সূরা মাউনের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যা পেশ করছি।

আমরা গোটা সূরার বিষয়কে দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি হলো পরকালে বা বিচার দিবস সম্পর্কে যারা অবিশ্বাস করে এমন প্রকাশ্য কাফেরদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ। আর অপরটি হলো মুনাফিকদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ। সূরার প্রথমে পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী কাফেরদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ- فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ- وَلاَ يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ

তুমি কি দেখেছ তাকে, যে (আখেরাতের) বদলাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ? ঐ ব্যক্তিই তো ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে (তাড়ায়) এবং মিসকীনের খাবার দিতে [illegible] না।

আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে– اَرَءَيْتَ 'তুমি কি দেখেছ'? বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয়, এ কথাটি নবী করীম (সাঃ)–কে সম্মোধন করে বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের বাচনভঙ্গী হলো, এ সব ক্ষেত্রে কুরআনে সাধারণতঃ প্রত্যেক জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তিকেই সম্মোধন করা হয়ে থাকে। সুতরাং যুগে যুগে সকল জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকেই একথা বলা হয়েছে। আর এখানে 'দেখার' কথা যা বলা হয়েছে তা যে চোখে দেখার কথা বলা হয়েছে তা কিন্তু নয়। এখানে পরবর্তীতে লোকদের যে অবস্থার কথা বলা হয়েছে, তাতো প্রত্যেক চাক্ষুষ্মান ব্যক্তি নিজ চোখে দেখতে পায়। তাছাড়া চোখে দেখার সাথে সাথে কথার তাৎপর্য অনুধাবন, জানা, বুঝা ও চিন্তা করাও এই দেখার মধ্যে শামিল রয়েছে। প্রকৃত 'দেখা' বলতে এই শেষোক্ত অর্থই বুঝতে হবে– নিছক চোখে দেখা নয়। যেমন আমরা কোন বিশেষ ব্যাপারে বলে থাকি ঃ 'আমি দেখেছি' এর অর্থ হয়-আমি জানি, আমি এ বিষয়ে অবহিত বা ওয়াকিফহাল আছি। অথবা বলে থাকি ঃ 'আপনি ব্যাপারটি একটু দেখুন'। এর অর্থ হয়– আপনি বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করুন বা স্মরণে রাখুন, কিংবা এর তত্ত্ব বুঝুন। সুতরাং এখানে اَرَءَيْتَ 'তুমি কি দেখেছ' কথাটি যদি এই দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করা হয়, তা হলে বাক্যটির অর্থ হবে ঃ 'তুমি কি জান, পরকালের বিচার ও প্রতিফলের কথা যে লোক অস্বীকার করে সে কি রকমের লোক' ? অথবা এ অর্থ হতে পারে ঃ 'পরকালের কর্মফল দানের ব্যবস্থাকে যে লোক অসত্য মনে করে, তার অবস্থাটা কি, তা কি তুমি চিন্তা ও বিবেচনা করেছ'?

www.pathagar.com

অতঃপর আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ অর্থাৎ যারা পরকালের বদলাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। আল-কুরআনে - اَلدِّيْنُ শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– প্রথম অর্থ-প্রভূত্ব ও প্রাধান্য, শক্তি ও আধিপত্য। দ্বিতীয় অর্থ– আনুগত্য ও দাসত্ব। তৃতীয় অর্থ– পথ, পন্থা, ব্যবস্থা, আইন, এক কথায় দ্বীন ইসলাম। চতুর্থ অর্থ– প্রতিফল, কর্মফল, বিচার। সূরা মাউন এর এই اَلدِّيْنُ (দ্বীন) অর্থ-প্রতিফল, কর্মফল, বিচার। অবশ্য কেউ কেউ এখানে দ্বীন অর্থ– পথ, পন্থা বা দ্বীন ইসলামও গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই অর্থটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্সীর এখানে প্রতিফল দান বা বিচার, এক কথাই পরকাল অর্থটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এখানে কর্মফল দান বা পরকাল অর্থটি সূরার বিষয়ের সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল।

অতঃপর পরবর্তীতে পরকালে অবিশ্বাসীদের চরিত্র স্বভাব ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ

ঐ ব্যক্তিই তো ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়ায়। فَذٰلِكَ الَّذِىْ বাক্যের শুরুতে লাগানো فَ (ফা) অক্ষরটি একটা পূর্ণ বাক্যের অর্থ জ্ঞাপন করে। এর অর্থ হলো– 'তুমি যদি না-ই জান, তা হলে তোমার জানা উচিত যে, 'এই সেই লোক'।

প্রথম চরিত্র বা কার্যকলাপ ঃ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ সে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। (এক) সে ইয়াতীমের হক মেরে খায় এবং তার পিতার রেখে যাওয়া সহায়-সম্পত্তি হতে বে-দখল করে তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। (দুই) ইয়াতীম তার কাছে সাহায্য চাইতে আসলে তার প্রতি দয়া পরবশ হবার পরিবর্তে তাকে ধিক্কার দেয়, রুঢ় ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেয়। এর পরও যদি সে নিজের দুরবস্থার জন্য দয়ার আশায় দাঁড়িয়ে থাকে তা হলে তাকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। (তিন) সে ইয়াতীম-এর উপর যুলুম করে। তার নিজের ঘরে নিজেরই কোন আত্মীয় ইয়াতীম হলে সারা ঘরের দাস-দাসীর কাজ করায় এবং কথায় কথায় হুমকি ও ধমক খাওয়া ছাড়া তার কপালে আর কিছুই জোটে না। ইয়াতীমদের সাথে এ ধরনের আচরণ যে কেবল কোন কোন সময় সংঘটিত হয় তা নয়। বরং তাদের এই কাজ ও আচরণ স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। সে এটাকে স্বাভাবিক কাজ মনে করে থাকে। ইয়াতীমদের সে মানুষই মনে করে না। তাদের প্রতি যুলুম-নির্যাতন, কোন কিছু চাইতে আসলে ধুর ধুর করে তাড়িয়ে দেয়া, প্রয়োজনে গলা ধাক্কা দেয়া বা ধাক্কাতে ধাক্কাতে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া কোন অন্যায় কাজ বলে মনেই করে না। কাজী

www.pathagar.com

আবুল হাসান আল-মা-আর্দি তাঁর اَعْلَامُ النُّبُوَّةِ নামক কিতাবে এই পর্যায়ে একটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হলো– আবু জেহেল ছিলো এক ইয়াতীম বালকের গার্জীয়ান। একদিন সেই বস্ত্রবিহীন ইয়াতীম বালকটি আবু জেহেলের কাছে তার বাপের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে কিছু দেবার জন্য অনুরোধ করলো। কিন্তু আবু জেহেল সেই বালকটির কথার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করলো না। সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিরাশ হয়ে চলে গেল। তখন কুরাইশ সর্দারেরা দুষ্টামি বশতঃ বালকটিকে বললো ঃ মুহাম্মদের কাছে গিয়ে নালিশ করো সে তোমার সম্পদ আবু জেহেলের কাছ থেকে আদায় করে দেবে। বালকটি তো জানতো না আবু জেহেল এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে সম্পর্ক কেমন। সে তাদের পরামর্শ সরল মনে বিশ্বাস করে সোজা মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে গিয়ে তার নিজের অবস্থা বর্ণনা করলো। নবী করীম (সাঃ) সব কথা শুনে তখনই উঠে বালকটিকে সাথে নিয়ে শত্রু আবু জেহেলের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। আবু জেহেল তাঁকে দেখে সম্বর্ধনা জানালো। নবী করীম (সাঃ) যখন আবু জেহেলকে বললেন ঃ এই বালকের যা কিছু পাওনা আছে তা তাকে দিয়ে দাও; সে তখনই তা মেনে নিয়ে তার পাওনা গন্ডায় গন্ডায় তাকে বুঝিয়ে দিলো। এ দু'জনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কি ঘটে এবং ঘটনা পরম্পরা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা দেখার জন্য কুরাইশ সর্দারেরা ওঁৎ পেতে বসেছিলো। আসলে তারা কোন কৌতুককর ঘটনা ঘটে যাবার আশা করেছিলো। কিন্তু তারা যখন এরূপ বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পেল তখন তারা বিস্মিত হয়ে আবু জেহেলের নিকট গিয়ে সে তার পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করেছে বলে তাকে ধিক্কার দিতে লাগলো। আবু জেহেল তাদেরকে কসম খেয়ে বললো ঃ খোদার কসম, আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করিনি। কিন্তু মুহাম্মদ যখন আমার কাছে আসলো তখন আমার কাছে স্পষ্ট মনে হলো– তাঁর ডান ও বামে এক একটা বিশেষ ধরনের অস্ত্র তার দিকে তাক করে ধরে আছে। যদি আমি তাঁর মতের বিপরীত কাজ করি তা হলে মনে হয় অস্ত্রগুলো আমার পেটের ভিতর ঢুকে যাবে। এই ঘটনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সেই জাহেলী যুগ আরবে ইয়াতীমদের সাথে কি ধরনেরই না আচরণ করা হতো। আর এটাও প্রমাণিত হয় যে, মক্কায় কাফের শত্রু সর্দারদের উপর মহানবী (সাঃ) এর নৈতিক চরিত্রের কত প্রভাব ছিলো।

দ্বিতীয় চরিত্র বা কার্যকলাপ ঃ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ। আর যারা মিসকীনের খাবার দিতে উৎসাহিত করে না। এখানে اِطْعَامُ الْمِسْكِيْنِ- 'মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর' কথা বলা হয় নাই। বলা হয়েছে طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ 'মিসকীনের খাবার'। প্রথম কথাটি বলা হলে এখানে অর্থ হতো– মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে সে লোকদেরকে

www.pathagar.com

উদ্বুদ্ধ করে না। এর পরিবর্তে দ্বিতীয় শব্দটি طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ 'মিসকীনের খাবার' দিতে লোকদেরকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে না। এই দৃষ্টিতে আয়াতের মূল বক্তব্য এই দাঁড়ায় যে, গরীব মিসকীনকে যে খাবার দেয়া হয় তা মূলতঃ দাতার নিজের খাবার জিনিস নয়। আসলে তা সেই মিসকীনেরই জিনিস। যা দাতার নিকট আমানত হিসেবে জমা আছে এবং তা দিচ্ছে মাত্র। অন্য কথায় এটা মিসকীনের অধিকারের অংশ। এটা দাতার কোন দান বা অনুগ্রহ নয়। বরং সে মিসকীনের ন্যায্য অধিকারের জিনিস-ই তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে মাত্র। যেমন আল কুরআনের অন্য এক আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে–

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

এবং তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে সায়েল (দাবীদার) ও বঞ্চিতদের হক বা অধিকার রয়েছে। (সূরা জারিয়াত-১৯)

وَلَا يَحُضُّ এর অর্থ ব্যাপক অর্থবোধক। এর অর্থ এই যে, সেই ব্যক্তি নিজেকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করে না, আর নিজের পরিবারের লোকদেরকেও বলে না যে, মিসকীনের খাদ্য-খাবার যেন অবশ্যই দেয়া হয়। আর সমাজে অসহায় নিঃসম্বল ক্ষুধার্ত গরীব-মিসকীনদের যে অধিকার আছে তা আদায়ের উদ্দেশ্যে সামষ্টিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে অন্যান্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ ও কর্মতৎপর করে তুলবার জন্যও কোন চেষ্টা চালায় না।

পরকালে অবিশ্বাসীদের কি ধরনের চরিত্র হয় তার নমুনা হিসেবে এখানে দু'টি চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তবে এটা মনে করা যাবে না যে, পরকালে অবিশ্বাসীদের চরিত্র বুঝি এ দু'টিই, আসলে তা নয়। এই চরিত্র ছাড়া আরও অসংখ্য চরিত্র রয়েছে পরকালে অবিশ্বাসীদের। এখানে মাত্র দু'টি মৌলিক চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো– তারা ইয়াতীমদেরকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, আর অপরটি হলো তারা মিসকীনদের খাবার দিতে উৎসাহ প্রদান করে না।

সূরার এই দ্বিতীয় অংশে মুনাফিকদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ– الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ– الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ– وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ–

অতঃপর ঐসব নামাযীদের জন্য ধ্বংস, যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করে, যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে এবং নিত্য ব্যবহারের জিনিসও অন্যকে দেয় না।

www.pathagar.com

এই আয়াত কয়টিতে মুনাফিকদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনটি চরিত্র উল্লেখ করা হয়েছে। চরিত্র তিনটি উল্লেখের পূর্বেই তাদের কঠিন পরিণতির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে– فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ অতঃপর নামাযীদের জন্য ধ্বংস। এখানে فَ অক্ষরটির অর্থ হলো– প্রকাশ্যে পরকালে অবিশ্বাসীদের চারিত্রিক অবস্থার যে বিবরণ উপরে এইমাত্র দেয়া হলো এটা তো বুঝতে পারলে, এখন মুনাফিকদের অবস্থা কি তা শুনে নাও। এই মুনাফিকরা সমাজের মুসল্লীদের অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে গণ্য। কিন্তু এরা বাহ্যিক ভাবে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু তারা পরকালকে সত্য মনে করে না-মিথ্যা মনে করে, এই কারণে তারা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের আয়োজন কিভাবে করেছে তা একবার লক্ষ্য করে দেখ!

مُصَلِّيْنَ শব্দের অর্থ হলো– মুসল্লী লোক, যারা সালাত আদায় করে। অর্থাৎ নামাযী। কিন্তু কথার যে ধারাবাহিকতায় এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরে যে পরিচয় দেয়া হয়েছে, তাতে এই শব্দটির অর্থ মূলতঃ 'মুসল্লী হওয়া' বা 'নামাযী হওয়া' নয়, বরং এর অর্থ 'সালাত ওয়ালা' বা 'মুসলিম সমাজের মধ্যে গণ্য লোক।

মুনাফিকদের প্রথম চরিত্র ঃ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে গাফেল বা অবজ্ঞা দেখায়। এখানে فِىْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ 'নামাযের মধ্যে অবজ্ঞা দেখায় বলা হয়নি'। বরং বলা হয়েছে عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ- 'নামাযের ব্যাপারে অবজ্ঞা দেখায়' فِىْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ বলা হলে আয়াতটির অর্থ এরূপ হতো– তারা নিজেদের নামাযের মধ্যে ভুল করে। কিন্তু এই অর্থ সঠিক নয়। কেননা, নামায আদায় করার মধ্যে বা নামায আদায় করতে যেয়ে কিছু ভুল হতে পারে। এটা কোন অপরাধ নয়। এর মধ্যে কোন গুনাহ্ নেই। তার কারণ নবী করীম (সাঃ) এর নামাযের মধ্যেও ভুল হয়েছে যা তিনি 'সহু সিজদাহ' এর মাধ্যমে ঠিক করে নিয়েছেন এবং তা করার জন্য নিয়ম করে দিয়েছেন। কাজেই এই অর্থ বা কথা এখানে প্রযোজ্য নয়। মূলেতো বলা হয়েছে– عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ "তারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে অবজ্ঞা দেখায়'। এর ব্যাপক অর্থ। অর্থাৎ নামাযের প্রতি তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। নামায আদায় করা হলো কি হলো না এই পার্থক্য তারা করে না। তারা কখনও নামায আদায় করে

www.pathagar.com

আবার কখনও কখনও করে না। নামায আদায় করলেও তাদের কোন সময়জ্ঞান নেই। নামাযের ওয়াক্ত বিনা কারণে পার করে দিয়ে দুই ওয়াক্ত একই সময়ে কাযা হিসেবে আদায় করে নেই। ফরজ নামাযে জামায়াতের কোন ধার ধারে না। নিজের যখন সুযোগ হয় তখন সে বাড়িতেই হয়তো অতি তাড়াতাড়ি আদায় করে নেই। নামায তাদের জন্য এক মহা কষ্টের জিনিস। এটাকে তারা মস্তবড় বোঝা মনে করে, যে কোন ভাবে বোঝা সরাতে পারলেই হয়। এই শ্রেণীর নামাযীদের নামাযের মধ্যে মন বসে না। মন ছটফট করে বেড়ায়। নামায শুরু করলেই তাদের মনের মধ্যে দুনিয়ার কথা এসে হাজির হয়ে যায়। নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক তাকায়। নামাযের মধ্যে নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ নিয়ে খেলায়। ঘন ঘন হাই হোলে। চোখে ঘুম এসে যায়। নামাযের মধ্যে কি পড়লো তার কোন খেয়াল করে না। রুকু-সিজদা ঠিকমত আদায় করে না। কাকের মতো কয়েকটি ঠোক্কর মারে মাত্র। আবার কেউ লোক চক্ষুর ভয়ে নামায আদায় করে। তাতে দেহ পাক থাক আর না থাক নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। ফলে এই শ্রেণীর লোকদের নামায নিছক লোক দেখানো নামাযে পরিণত হয়ে যায়। আসলে তাদের পরকালে ঈমান না থাকার কারণেই তারা এরূপ করে।

মুসলমান দাবীদার এই মুনাফিকদের আখেরাতের শাস্তির প্রতি কোন ভয় নেই। এই কারণে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) ও আতা ইবনে দীনার (রহঃ) বলেনঃ আল্লাহ্‌র শোকর যে তিনি- فِىْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ বলেন নাই। বলেছেন-عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ কেননা আমরা নামাযের মধ্যে ভুল করে থাকি বটে। কিন্তু নামাযের ব্যাপারে আমরা অবজ্ঞা দেখাই না। আমরা তার প্রতি গাফেল নই। এই কারণে আমরা মুনাফিকদের মধ্যে গণ্য হবো না। যদি প্রথম কথাটি বলা হতো তাহলে নামাযের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য আমরা মুনাফিকদের মধ্যে গণ্য হয়ে যেতাম। নামাযের ব্যাপারে অবজ্ঞা প্রদর্শন মুনাফিকীর একটা বড় লক্ষণ। এই অবস্থার কথা কুরআন মজীদের অপর আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে–

وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ–

অর্থাৎ তারা (মুনাফিকরা) নামাযের জন্য আসে না–আসে অবজ্ঞা ভরে অনিচ্ছা সত্ত্বে। আর (আল্লাহ্‌র পথে অর্থ) খরচ করে না করে– অত্যন্ত অনাগ্রহে। (তাওবাহ-৫৪)।

নবী করীম (সাঃ) মুনাফিকদের নামায সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ঃ এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকদের নামায, এটা মুনাফিকদের নামায। আসরের সময় বসে থেকে সূর্য দেখতে থাকে। যখন তা শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখানে পৌঁছে যায় (অর্থাৎ সূর্য ডোবার সময় হয়ে যায়) তখন উঠে

www.pathagar.com

চারটি ঠোকর মারে। এতে আল্লাহকে খুব কম-ই স্মরণ করা হয়। (বুখারী-মুসলিম, আহমদ)

অন্য হাদীসে হযরত মুসয়াব তার পিতা সায়াদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ যেসব লোক নামাযের ব্যাপারে অবজ্ঞা দেখায় তাদের সম্পর্কে আমি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এরা সেই লোক, যারা নামায তার নির্দিষ্ট সময় পার করার পর আদায় করে থাকে। (ইবনু জরীর, আবু ইয়ালা, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবু হাতিম, তাবারানী, ইবনু মারদুইয়া, বায়হাকী)।

মুনাফিকদের প্রথম যে চরিত্র এবং কার্যকলাপ তা হলো– তারা নামাযের সার্বিক ব্যাপারে গাফেল, অমনোযোগী এবং অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী।

দ্বিতীয় চরিত্র ও কার্যকলাপ ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ আর যারা লোক দেখানো কাজ করে। এটা একটি স্বতন্ত্র বাক্যও হতে পারে। আবার প্রথম বাক্য নামাযের সাথে সম্পর্কিতও মনে করা যেতে পারে। যদি একে একটি স্বতন্ত্র বাক্য ধরা হয় তাহলে এর অর্থ বা তাৎপর্য হবে– এই লোকেরা কোন একটি নেক কাজও খালেশভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করে না। যা কিছু করে, তা নিছক লোক দেখানোর জন্যই করে। এ কাজে তাদের উদ্দেশ্য থাকে লোক-জন এই নেক কাজের জন্য তাদের প্রশংসা করুক। তাদেরকে নেক্কার, পরহেজগার মনে করুক। তাদের এসব সৎ কাজে ঢাক-ঢোল পিটাক। আর এই কাজের ফলটা তারা কোন না কোন ভাবে এই দুনিয়ায়-ই লাভ করুক।

অপর পক্ষে যদি এই অর্থ বা তাৎপর্য পূর্বের বাক্য নামাযির সাথে সম্পর্কিত বাক্য মনে করা হয়, তা হলে এর তাৎপর্য হবে– তারা লোক দেখানো নামায আদায় করে। তাফসীরকারগণ এই দ্বিতীয় অর্থটিকেই বেশী অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়, এই বাক্যাংশটি পূর্ববর্তী বাক্যের অংশ ও উহার সাথে সম্পর্কিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "এই বাক্যে মুনাফিকদের কথাই বলা হয়েছে। কেননা, তারা লোক দেখানো নামায আদায় করে থাকে। অন্য কোন লোক থাকলে নামায আদায় করে। আর যদি কেহ দেখার না থাকে তাহলে আদায় করে না"। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে– "একাকী থাকলে (নামায) আদায় করে না, আর প্রকাশ্য ভাবে আদায় করে"। (ইবনে জরীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবু হাতিম, ইবনে মারদুইয়া, বায়হাকী)।

আল কুরআনের অন্য আয়াতে মুনাফিকদের এই অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে–

وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا–

www.pathagar.com

তারা যখন নামাযের জন্য উঠে, তখন তারা আলস্য ভরে উঠে। লোকদের দেখায়। আর আল্লাহকে তারা খুব কমই স্মরণ করে। (সূরা নিসা–১৪২)

মুনাফিকদের তৃতীয় চরিত্র বা কার্যকলাপ ঃ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

আর তারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসও অন্যকে দেয় না। সূরার সর্বশেষ এবং মুনাফিকদের সর্বশেষ চরিত্র হলো– তারা সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় ছোটখাট জিনিস অপরকে দিতে চায় না।

مَاعُوْنَ শব্দের অর্থে– হযরত আলী (রাঃ) এবং তাঁর মতের অনুসারী একদল তাফসীরকারক বলেছেন 'মাউন' শব্দ দ্বারা 'যাকাত' বোঝানো হয়েছে। অপর পক্ষে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং তাঁর মতের অনুসারী তাফসীরকারক বলেছেন যে, 'মাউন' শব্দের অর্থ সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। চুলা, ডুলি, দাও, কুড়াল, দাঁড়িপাল্লা, নুন, পানি, আগুন, ফায়ার লাইট বা দিয়াশলাই প্রভৃতি ক্ষুদ্র অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এই পর্যায়ে পড়ে।

মাউন শব্দের অর্থে রাসূল (সাঃ) নিজে এই আয়াতের তাফসীর করে বলেছেন যে, এর অর্থ কুড়াল, ডুলি ও এই ধরনের জিনিসপত্র। হযরত ইবনে আব্বাসও এই অর্থ গ্রহণ করেছেন।

আসল কথা হলো– 'মাউন' বলা হয় ক্ষুদ্র ও স্বল্প জিনিসকে। যার দ্বারা লোকেরা সামান্য কিছু উপকৃত হয়। এই অর্থের দৃষ্টিতে যাকাতও মাউনের মধ্যে গণ্য। কেননা, তা তো বিপুল সম্পদের একটা ক্ষুদ্র অংশমাত্র। আর এটা দরিদ্রদের সাহায্যের জন্যই দেয়া হয়। যেমন হযরত আলী (রাঃ) এবং তাঁর মতের লোকজন বলেছেন। এছাড়া অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসও মাউন এর মধ্যে গণ্য। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং তাঁর মতের লোকজন বলেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে 'মাউন' বলতে সেই সব সাধারণ জিনিসকে বুঝায় যা লোকেরা সাধারণ ভাবে অভ্যাস বশত একে অপরের নিকট হতে চেয়ে নেয়। আর এসব জিনিস চাইতে লজ্জা-সংকোচবোধও করে না। কেননা, ধনী-গরীব, স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল সব ধরনের লোকেরই এসব জিনিস কোন না কোন সময় প্রয়োজন দেখা দেয়। যা না চাইলে তার মোটেই চলে না। সুতরাং এসব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিতে অস্বীকার করা বা কার্পণ্য করা নীতি নৈতিকতার দিক দিয়ে খুবই হীন আচরণ বলে বিবেচিত হয়।

এসব জিনিসের বিনিময় হয়ে থাকে সাধারণতঃ প্রতিবেশীদের মধ্যে। সুতরাং এসব ছোটখাট নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস না দেয়া প্রতিবেশী সুলভ আচরণের খেলাপ এবং প্রতিবেশীর যে হক বা অধিকার আছে তারও পরিপন্থী।

মোট কথা এই আয়াতটির বক্তব্য হলোঃ পরকালের প্রতি অবিশ্বাস মানুষকে এতই সংকীর্ণমনা ও নীচহীন বানাইয়া দেয় যে, সে অপরের জন্য সামান্য একটু কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত নয়।

www.pathagar.com

প্রিয় ভায়েরা/বোনেরা। 'সূরা মাউন'-এ বর্ণিত যে পাঁচটি আচরণ-এর কথা উপরে দু'টি ভাগে ভাগ করে উল্লেখ করা হলো– আখেরাত বা পরকালের প্রতিদান সম্পর্কে অবিশ্বাসী হওয়ার কারণেই মুলতঃ তারা এসব আরচণ এবং মুনাফেকী কাজ করে থাকে। যদি তারা আখেরাতের প্রতিদান সম্পর্কে বিশ্বাসী হতো তাহলে তারা এ ধরনের আচরণ এবং কার্যকলাপ কখনই করতে পারতো না।

শিক্ষা ঃ আলোচ্য সূরা মাউনে যেসব শিক্ষা রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

● আমাদের প্রত্যেকেরই আখেরাত বা পরকালের বদলা বা প্রতিদান সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।

● ইয়াতীমদের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে। তাদের পিতার রেখে যাওয়া কোন স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ-সম্পত্তি আমানত হিসাবে জমা থাকলে বয়োপ্রাপ্ত হবার সাথে সাথে বুঝিয়ে দিতে হবে।

● ইয়াতমীদের সাথে খারাপ এবং রূঢ় আচরণ তো করা যাবেই না। বরং তাদের সাথে আগবেড়ে ভালো ব্যবহার এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে। এমন ব্যবহার করা যাবে না যাতে তারা মনে কষ্ট পায়।

● সমাজে যারা অসহায়-দরিদ্র রয়েছে তাদের মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য-খাবার, পোষাক-আশাক, সেবা-শুশ্রুষা, চিকিৎসা, বসবাসের জায়গা এবং শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা যে করতে হবে তাদের অনুগ্রহের জন্য তা নয়। বরং ব্যক্তি ও সমাজের কাছে তাদের যে হক বা অধিকার রয়েছে তাই আদায় করতে হবে।

● মিসকীন তথা অসহায় দরিদ্রদের নিজে যেমন সাহায্য-সহযোগীতা করতে হবে তেমনি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে এবং সমাজের অন্যান্য লোকদেরকে তাদের খাদ্য-খাবার দেওয়া এবং প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করতে হবে।

● নামাযের (ভিতর-বাইরে) সকল হক আদায় করে নামায পড়তে হবে। নামাযের ব্যাপারে কোন ভাবেই উদাসীন এবং গাফেল হওয়া যাবে না। কেননা, নামাযের প্রতি উদাসীনতা হলো মুনাফিকীর লক্ষণ।

● নামায যেমন লোক দেখানোর জন্য আদায় করা যাবে না। তেমনি অন্যান্য নেক বা সৎ কাজও মানুষের সন্তুষ্টি এবং দুনিয়াতেই প্রশংসা লাভের আশায় করা যাবে না। নামায হোক বা অন্যান্য নেক কাজ হোক সকল আমলের পেছনে একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টি থাকতে হবে।

● পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় সাধারণ জিনিস প্রতিবেশীদের সাথে লেন-দেন করতে হবে। যদি সম্ভাবনা থাকে এবং এমন প্রতিবেশী হয় যে, সে একবার কোন জিনিস পেলে আর ফেরত দেবে না বা আত্মসাত করার সম্ভাবনা থাকে তাহলে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জিনিস দেয়া যাবে না।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। - আল হাদীস

লেখকের অন্যান্য বই

দারসে হাদীস-১ম খন্ড
দারসে হাদীস-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-১ম খন্ড
দারসে কুরআন-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-৩য় খন্ড
দারসে কুরআন-৪র্থ খন্ড
ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ
বিষয়ভিত্তিক নির্বাচিত হাদীস
আল কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব
রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রূহানী নামায
বিষয়ভিত্তিক কুরআন হাদীস সংকলন
বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোয়া
কুরআন হাদীসের আলোকে ৫দফা কর্মসূচী
ফাযায়েলে ইক্বামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার (চেষ্টার) মর্যাদা

সাহাল প্রকাশনী

www.pathagar.com